বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত
(১৭. ১১. ১৯৩৮ তারিখের কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞান-প্রবেশ

প্রথম ভাগ

(সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক
শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়,
এম. এস-সি. (কলিকাতা), ডি. এস-সি. (লণ্ডন), ডি. আই. সি. (লণ্ডন)
ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের 'পালিত' অধ্যাপক
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র,
এম. এ. (কলিকাতা), পি-এচ. ডি. (বার্লিন), এফ. এন. আই.
প্রণীত

বাণীমন্দির
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

 [মূল্য বার আনা

প্রকাশক :
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ.
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৮

প্রাপ্তিস্থান :
বাণীমন্দির
বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।
শিক্ষক-সমবায় লাইব্রেরী
যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম।

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫,৬, চিন্তামণি দাশ লেন, কলিকাতা।

নিবেদন

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব এই কয়টি বিষয় সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুযায়ী এই কয়টি বিষয় বিজ্ঞান-প্রবেশ প্রথম ভাগে আলোচিত হইয়াছে।

এই পৃথিবী জড় ও জীবজগতের সমন্বয়ে গঠিত। তাই প্রাকৃত বিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান এই দুইভাগে বিভাগ করা হইয়াছে।

পদার্থবিদ্যা জড়বিজ্ঞানের মূলে। জড়ের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম, জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, শক্তির নানাপ্রকার রূপান্তর— এই সমস্তই পদার্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তাই, পদার্থবিদ্যাই আমরা জড়বিজ্ঞানে সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করিয়াছি।

পদার্থের বাহ্য গুণ ও ধর্ম্মের আলোচনা শেষ হইলেই তাহার উপাদান, গঠন-বৈচিত্র্য, প্রস্তুতকরণ-প্রণালী, ব্যবহার প্রভৃতি জানিতে আমাদের আগ্রহ হয়। এইজন্য পদার্থবিদ্যার পরই রসায়নবিদ্যার স্থান।

জড়বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময় আকাশমণ্ডল। সূর্য্যের তীব্র জ্যোতিঃ, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, তারকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককণা শিশুমনকে অভিভূত করিয়া দেয়। সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রশোভিত বিশাল আকাশমণ্ডল শিশুর অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া তোলে। একারণ বিষয়বিন্যাসের

বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করিতে যাইয়া আমরা জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে তৃতীয় স্থান দিয়াছি।

সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ পৃথিবী। আমাদের আশ্রয়দাত্রী এই পৃথিবীর গঠনবৈচিত্র্য শিশুমনকে অনুসন্ধিৎসু করিয়া তোলে। তাই, ভূতত্ত্বকে আমরা জড়বিজ্ঞানে চতুর্থ স্থান দিয়াছি।

আশা করি, এই প্রণালীতে শিক্ষাদান করিলে পঠন এবং পাঠন উভয় বিষয়েই সুবিধা হইবে।

শিক্ষার্থিগণকে কলেজে অধ্যয়ন কালে বিজ্ঞান আলোচনা ইংরেজীতে করিতে হইবে। অধিকন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ইংরেজীতেই প্রদত্ত হইবে। এই জন্য আমরা প্রশ্নাবলীতে ইংরেজী ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছি। পুস্তকমধ্যে বৈজ্ঞানিক বাংলা শব্দ-সমূহের ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে; সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীগণের কোনও রূপ অসুবিধা হইবে না।

বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৮

শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

সূচীপত্র

জড়-বিজ্ঞান

পদার্থ-বিদ্যা

রসায়ন-বিদ্যা

জ্যোতির্ব্বিদ্যা

বিষয়

ভূতত্ত্ব



জড়-বিজ্ঞান

উপক্রমণিকা

বিজ্ঞানের উৎপত্তি—আপন বুদ্ধি ও বিবেচনা বলে মানব প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। সে হিংস্র জন্তুকে বশে



ভারবাহী জন্তু

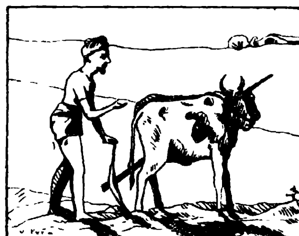


পর্ব্বতারোহণ

আনিয়াছে। বনের হাতী, ঘোড়া, উট ও গাধাকে মোট বহাইয়াছে।



গুহামানব



কৃষিকর্ম্ম

অত্যুচ্চ পর্ব্বত আরোহণ করিয়াছে। বেগবতী নদী ও উত্তাল

১—১

তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়াছে। দৈহিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করিলেও বুদ্ধিবলে সে সকল সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে। এই বুদ্ধি ও বিচারশক্তিই হইল বিজ্ঞানের ভিত্তি।



রন্ধন



গোপালন

আদিম মানব পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। তাহারা অস্ত্রের ব্যবহার জানিত না। কৃষি, রন্ধন, বা পশুপালন কিছুই বুঝিত না। কিন্তু



ধনু-নির্ম্মাণ



কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালান

এভাবে তাহারা থাকিতে চাহিল না। বাহিরের সহিত সংগ্রামে তাহারা গাছের ডাল বাঁকাইয়া ধনু তৈয়ার করিল। কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালিল। পাথর ঘষিয়া অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিল। ক্রমে

সমাজবন্ধনে আসিয়া, কৃষি ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া সভ্যতার উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে তাহাদের বহুহাজার বৎসর পার হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানব সভ্যতার চরমোন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের আরম্ভ হইল সেই দিন, যেদিন আদিম মানব আগুন জ্বালিতে শিখিল, বা পাথর হইতে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিল।



অস্ত্র-নির্ম্মাণ

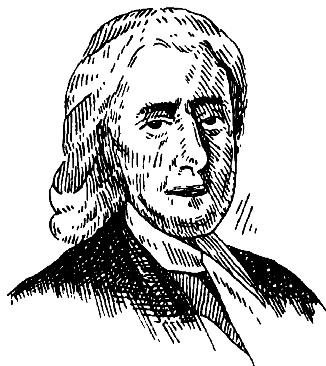
বিজ্ঞান কোন সংস্কারাবদ্ধ নহে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সন্ধানই বিজ্ঞানের ধারা। পর্য্যবেক্ষণ, পর্য্যালোচনা এবং সত্যের অনুসন্ধানই বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র।

জড় ও জীব—অচেতন পদার্থ মাত্রই জড়। যাহার ভার আছে, যাহা স্থান অধিকার করে, যাহার অস্তিত্ব আমরা চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা অনুভব করিতে পারি, তাহাকেই জড় পদার্থ বলে। জীবের জন্ম আছে, বুদ্ধিশক্তি আছে, মৃত্যু আছে, অধিকাংশের চলচ্ছক্তি আছে, কিন্তু জড়পদার্থের এরূপ কোনও গুণ নাই। বস্তুতঃ, জড়-শব্দের অর্থ হইতে এই গুণাবলীর একান্ত অভাবই সূচিত হয়।

চেতন ও অচেতন পদার্থের সম্বন্ধ—প্রাণীর বা উদ্ভিদের দেহ অচেতন জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত। জীবের মৃত্যু ঘটিলে, অর্থাৎ তাহার চেতনা বা প্রাণশক্তি অন্তর্দ্ধান করিলে, যাহা পড়িয়া থাকে তাহা অচেতন বা জড় পদার্থ মাত্র। জড়জগতের জল, বায়ু, মাটি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া জীবগণ আপন আপন দেহ বৃদ্ধি করে।

জড় জগতের পঞ্চভূত উপাদান—প্রাচীনেরা বলিতেন যে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত দ্বারা জড়জগৎ গঠিত। ইহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে জগতের পঞ্চ উপাদান—মাটির ন্যায় কঠিন পদার্থ, জলের ন্যায় তরল পদার্থ, মরুতের ন্যায় বায়বীয় পদার্থ, তেজস্ বা শক্তিপুঞ্জ এবং সর্ব্বশেষে অনন্ত মহাকাশ বা মহাশূন্য। পদার্থ-বিদ্যায় দেখা যায় যে সত্যই পদার্থের কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন রূপ, এবং এই ত্রিমূর্ত্তি পদার্থ ও মহাশূন্য কিরূপ শব্দ, আলোক প্রভৃতি নানাশক্তির বাহনরূপে কার্য্য করিতেছে।

পদার্থ-বিদ্যা (Physics)—মানবের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে পদার্থবিদ্যার স্থান খুবই উচ্চে। পদার্থবিদ্যার চর্চ্চা না করিলে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, বৈদ্যুতিক চুল্লী, গ্রামোফোন, রেডিও প্রভৃতি কোন দিন আসিত না। মোটর চলিত না, আকাশে বিমানপোত উড়িত না।



নিউটন

ভারতবর্ষে পদার্থবিদ্যার মূলতত্ত্ব পরমাণুবাদের প্রবর্ত্তক হিসাবে কণাদের নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টের জন্মের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে আর্কিমিডিস্ (Archimedes) ভাসমান ও মজ্জমান পদার্থের রীতি নির্ণয় করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিও দোলক-নীতি আবিষ্কার করিলেন। ইহা হইতে হায়গেনস্ (Huygens) ঘড়ি আবিষ্কার করেন। আবহাওয়ার প্রকৃতি এবং পর্ব্বতের উচ্চতা নিরূপণে ব্যারোমিটারের উদ্ভাবন করেন টরিসেলি (Torricelli)। নিউটন (Newton) প্রিজ্‌ম দ্বারা সূর্য্যরশ্মির

বিশ্লেষণ এবং রামধনু ও অন্যান্য বিষয়ের তথ্য নির্দ্ধারণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেমস্ ওয়াটের (James Watt) প্রতিভা বলে ষ্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কার হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার আরও দ্রুত প্রসার ঘটিল। ইটালিতে ভল্টা (Volta) তড়িৎ-প্রবাহ উদ্ভাবন ও উৎপন্ন করিলেন। তড়িতের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন আম্পিয়ার (Ampere)। ফ্যারাডে (Faraday) তড়িতের অনেক নূতন নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। একবার ফ্যারাডে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, একটি তারের কুণ্ডলীর নিকট একটি চুম্বক আনিলে কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া যায়। একজন মহিলা ইহাতে ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"পরীক্ষাটি ত বেশ সুন্দর হইল, কিন্তু ইহার উপকারিতা কি?" ফ্যারাডে বলিলেন—"ঠিক জানি না, কিন্তু আপনারা ক্ষুদ্র শিশুকে পালন করেন কেন? কারণ, হয়ত সে বড় হইয়া সমাজের মঙ্গল করিতে পারিবে।" সেইসভায় প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফ্যারাডের সহিত মহিলাটির কথোপকথনের কথা জানিতেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনিও ফ্যারাডেকে ঐ পরীক্ষার উপকারিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ফ্যারাডে বলিলেন যে "হয়ত শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যখন ইহা হইতে আপনি অনেক কর আদায় করিতে



ফ্যারাডে

পারিবেন।" সে দিন আসিতে বিলম্ব হয় নাই। এই পরীক্ষার ফলে ডাইনামো চালাইয়া প্রচুর তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হইতেছে। আশু উপকারিতা না জানিলেই যদি বৈজ্ঞানিক তথ্যের কোন মূল্য না থাকে, তাহা হইলে জগতে কোনও বড় বৈজ্ঞানিক তথ্যেরই আবিষ্কারের সময় মূল্য নির্দ্ধারণ শক্ত। বৈজ্ঞানিকগণ সর্ব্বদাই নূতন নূতন আবিষ্কারের জন্য যত্নবান হন। কে বলিতে পারে কোন্ আবিষ্কার কোন্ দিন জগতের প্রভূত উপকারে আসিবে?

লর্ড কেল্‌ভিন (Lord Kelvin) ও ম্যাক্সওয়েলের (Maxwell) কল্পিত ইথার-তরঙ্গের অস্তিত্ব অধ্যাপক হার্জ (Hertz) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক রন্‌ট্‌জেন (Rontgen) এক নূতন রশ্মির অস্তিত্বের আবিষ্কার করিলেন। তাহাতে চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষতঃ অস্ত্রোপচারে প্রভূত উপকার কেন নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক আলভা এডিসন (Alva Edison) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গ্রামোফোন ও ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব দ্বারা মানবের অনেক উপকার হইয়াছে। ইতালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনি (Marconi) বেতার দ্বারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রসায়ন-বিদ্যা (Chemistry)—ইহা একটি অতি পুরাতন শাস্ত্র। ইহার নানা প্রাচীন তত্ত্বের কতক অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন মিশরের মামীতত্ত্ব এখন আর জানা নাই।

ভারতের প্রাচীন রাসায়নিকের মধ্যে নাগার্জ্জুনের নাম প্রধান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়র (Lavoisier) আধুনিক রসায়নের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই দহন-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বায়ুর উপাদান নির্ণয় করেন। প্রিষ্টলি

(Priestley) অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। ক্যাভেণ্ডিশ (Cavendish) জল যে যৌগিক পদার্থ ও তাহার উপাদান যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তাহা আবিষ্কার করেন। সীলে (Scheele) ক্লোরিণ গ্যাস আবিষ্কার করেন। ইহা নানা বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। ক্লোরিণ দ্বারা ক্লোরোফর্ম প্রস্তুত হইয়া অস্ত্রোপচারে রোগীর যন্ত্রণা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পার্কিন (Perkin) আলকাতরা হইতে নানা সুন্দর রং প্রস্তুত করেন। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক বায়ার (Baeyer) সস্তায় কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া নীলের চাষ উঠাইলেন। ডেভি (Davy) রসায়নে তড়িৎ-শক্তি ব্যবহারের প্রচলন করিলেন। তাহার ফলে সস্তায় এলুমিনিয়ম ধাতু প্রস্তুত হইল; ইলেকৃট্রোপ্লেটিং বা তাড়িতরঞ্জন (গিল্টি) হইতে লাগিল। নোবেল (Nobel) বিস্ফোরক বাহির করিয়া বড় বড় পাহাড় প্রভৃতি বিচূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বিংশ শতাব্দীতে মাদাম কুরী (Madam Curie) রেডিয়ম আবিষ্কার করেন। ইহাতে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ ও নানাবিধ জটিল রোগের উপশম হইতেছে। রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে কৃত্রিম হাড়, চামড়া, হস্তিদন্ত, রেশম প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ক্রমোন্নতিতে মানবের প্রভূত উপকার হইয়াছে এবং আরও কত উপকার হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।



ল্যাভয়সিয়র

জ্যোতির্ব্বিদ্যা (Astronomy)—জীবের বসতি পৃথিবী নামক এক ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডের উপরের স্তরে মাত্র। ভূমি ছাড়িয়া বায়ুমণ্ডলে কিছু দূর উর্দ্ধে উঠিলেই জীবজগতের শেষ। আবার ভূগর্ভে কিয়দ্দূর নামিলেই প্রাণী বা উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র পাইবে না। জীবজগতের অস্তিত্ব এই সঙ্কীর্ণ প্রদেশটুকুতে। জড়জগৎ কিন্তু বিশাল, অন্তহীন। অনন্ত মহাকাশে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত কোটি জড়পিণ্ড যে ভাসিতেছে, তাহার সংখ্যা কেন, কল্পনা করাও দুরূহ। এই সমস্ত বিমানচারী গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্র-নীহারিকার সংবাদ আমরা কিছু কিছু পাইয়া থাকি জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা করিয়া। ইউরোপের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে এই বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য ও ব্রহ্মগুপ্তের নাম এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ টলেমির (Ptolemy) মতে পৃথিবী সৌর-জগতের কেন্দ্র, অর্থাৎ সূর্য্য ও গ্রহগণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এই মতই ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্ম্মান পণ্ডিত কোপার্নিকাস্ (Copernicus) সিদ্ধান্ত করিলেন যে সূর্য্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। আজ পর্য্যন্ত সেই মতই চলিতেছে।

ভূতত্ত্ব (Geology)—বসুন্ধরার জীবন-বৃত্তান্ত অর্থাৎ সূর্য্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত বাষ্পময় জড়পিণ্ড কিরূপে ধীরে ধীরে পর্ব্বত-কন্দর নদ-নদী সাগর সমতট শোভিত বর্ত্তমান ভূমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি ল্যাপলাস (Laplace), জিন্স্ (Jeans) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের পরিকল্পনা হইতে। ভূতত্ত্ব হইতে আমরা জানিতে পারি ভূমিকম্প হয় কেন, জ্বালামুখী পর্ব্বত অগ্নি উদ্গীরণ করে কেন। যে স্থান আজ সমুদ্রের অতল গর্ভে তাহা চিরকাল তথায় ছিল না। যে স্থানে আজ বিশাল পর্ব্বত সে স্থানে অতীতে সমুদ্র গর্ভ

ছিল। দ্বীপের উৎপত্তি, জীবাশ্ম, আদিমযুগে জীবের অস্তিত্ব, অধুনালুপ্ত অতিকায় জীব ও বিশাল সরীসৃপের অস্তিত্ব, কেরোসিন তৈল, পেট্রোলিয়ম, পাথুরিয়া কয়লা, খনিজ ধাতু প্রভৃতির তথ্য ভূতত্ত্ব হইতে জানিতে পারা যায়।

নব নব গবেষণার দ্বারা জগতের কত জটিল রহস্যের সমাধান হইবে। দেশের ও দশের আর্থিক উন্নতি, সুখ সুবিধা, সকলই বিজ্ঞানের উন্নতির উপর নির্ভর করে।

মানব ও জড়-বিজ্ঞান—জড়জগতের বায়ু শ্বাসরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা জীবনধারণ করি। তাহার জল পান করিয়া, তাহার মাটি হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করি। এই জল, বায়ু ও মাটি না থাকিলে আমরাও থাকিতাম না। যে জড়পদার্থের সহিত আমাদের এমন নিকট সম্বন্ধ তাহার উপাদান, প্রকৃতি ও স্বরূপ, তাহার উপর বিভিন্ন শক্তিসমূহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়।

মাপ ও মাপকাঠি—কোন কিছুর পরিমাণ জানাইতে হইলে, উহা একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি বা "একক"-এর কতগুণ বড় তাহাই বলিতে হয়। সরল রেখার পরিমাণ বা দৈর্ঘ্য আমরা কিরূপে নির্দ্দেশ করি? মাপকাঠি দিয়া। হাত বা অঙ্গুলি আমাদের দেশে সাধারণ মাপকাঠি।

ইঞ্চি, ফুট, গজ ও মাইল—ইংলণ্ডের রাজকোষে একটি ধাতুদণ্ড রক্ষিত আছে, তাহার দৈর্ঘ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে এক ইয়ার্ড (yard) বা গজ। ইহারই তৃতীয়াংশ ফুট, ও ফুটের দ্বাদশাংশ ইঞ্চি। এক গজের ১৭৬০ গুণ হইল এক মাইল। তাহা হইলে ইংলণ্ডে দৈর্ঘ্য-মাপের একক হইল এক ইয়ার্ড (yard)। যত বড় জিনিষের

মাপ করিতে হইবে এককও তত বড় হওয়া চাই, নহিলে হিসাব করা দুরূহ হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র রেখার মাপকাঠি ইঞ্চি, অপেক্ষাকৃত বড় রেখার গজ ও সুদীর্ঘ রেখার যথা রেলপথ ইত্যাদির, মাইল। আমাদের বসুন্ধরার উপরের রেখার মাপ লওয়ার কাজে ইহা অপেক্ষা বড় এককের প্রয়োজন নাই।

আলোক বৎসর—যখন পৃথিবী হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্ব নির্দ্দেশ করিতে হয়, তখন মাপকাঠিও তদ্রূপ বিশাল আবশ্যক। এই মাপকাঠির নাম **আলোক বৎসর**, অর্থাৎ এক বৎসরে আলোক যতদূর চলে ততদূর। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল চলে; সহজ হিসাব করিলেই পাইবে পূর্ণ এক বৎসরে কত কোটি মাইল যায়। জ্যোতিষের এই মাপকাঠি অনুসারে কেনোপস নক্ষত্র পৃথিবী হইতে সাড়ে চার আলোক বৎসর দূর, সূর্য্য মিনিট আষ্টেক দূর, আর চন্দ্র ত ঘরের কাছে অর্থাৎ দেড় সেকেণ্ডেরও কম।

দশমিক পন্থায় মাপ—বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে দৈর্ঘ্যের মাপ সাধারণতঃ লওয়া হয় দশমিক পন্থায়, মিটারকে (m) একক ধরিয়া। মিটারের শতভাগের এক ভাগকে সেণ্টিমিটার (cm) ও সহস্রভাগের এক ভাগকে মিলিমিটার (mm) বলে। হাজার মিটারে এক কিলোমিটার (km) হয়। এই প্রণালীর মাপকে মেট্রিক প্রণালীর (metric system) মাপ কহে। মেট্রিক শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন মেট্রাম্ হইতে,—উহার অর্থ মাপ। এক ইঞ্চি প্রায় আড়াই সেণ্টিমিটারের সমান।

ক্ষেত্রফল মাপ—রেখার মাপকাঠি যেখানে এক গজ (yard), সেখানে ক্ষেত্রফল মাপের একক হইবে এক বর্গ-গজ (square yard)। তেমনই যেখানে রেখার মাপ হয় মিটারে, সেখানে ক্ষেত্রের

মাপ হইবে বর্গ-মিটার বা square metre-এ, জমি-মাপের সাধারণ একক এদেশে বিঘা, ইংলণ্ডে একর (Acre)।

ওজনের মাপ—ওজনের মাপের একক এদেশে সের। প্রদেশভেদে কিন্তু সেরের পরিমাণ বিভিন্ন। আটাশ তোলা হইতে আশী তোলা পর্য্যন্ত নানা রকম সের আছে। ইংলণ্ডের ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। তত্রত্য রাজকোষে এক ধাতুপিণ্ড রক্ষিত আছে তাহার ওজনকে বলা হয় এক পাউণ্ড (pound)। তাহাই সেদেশে সর্ব্বত্র ওজনের মাপকাঠি।

বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে সাধারণতঃ গ্রাম (gramme)কে ওজনের একক ধরা হয়। ইহাকে দশগুণ বা দশ ভাগ করিয়া বড় ছোট একক পাওয়া যায়। যথা—কিলোগ্রাম (সহস্র গ্রাম), সেণ্টিগ্রাম (গ্রামের শতাংশ) ইত্যাদি। গ্রামের সহিত আবার মিটারের যোগ আছে। ৪ চার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার এক ঘন সেণ্টিমিটার (1c. cm) জলের ওজন এক গ্রাম।

তুলাদণ্ড—যে পদার্থের ওজন জানিতে চাও তাহাকে এক দিকের পাত্রে রাখিয়া অন্যদিকে নির্দ্দিষ্ট একক গণিয়া দিতে হয় যতক্ষণ না দণ্ড ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল হয়। রাসায়নিক তুলাদণ্ডে, দণ্ডের মধ্যস্থলে একটি কাঁটা বা স্থচ সংলগ্ন থাকে। এই স্থচের অগ্রভাগ এক স্কেলের উপর নড়ে। দণ্ড ভূতলের সমান্তরাল হইলেই কাঁটা উল্লম্ব হয়, অগ্রভাগ স্কেলের ঠিক মধ্যস্থলে আসিযা দাঁড়ায়। তখন দুই দিকের ভার সমান হইল বুঝিতে হইবে।

তাপ ও চাপের মাপ—তাপমান ও চাপমান যন্ত্রের উপরে স্কেল চিহ্নিত আছে। সেই স্কেল পড়িয়া বুঝিতে হয় যে নির্দ্দিষ্ট এককের কত গুণ তাপ বা চাপ যন্ত্রে দেখা যাইতেছে। একক ভেদে তাপমান

যন্ত্র তিন প্রকারের (১) সেণ্টিগ্রেড (Centigrade), (২) রেমার (Reaumur), (৩) ফারেনহাইট (Fahrenheit)।

সময়ের মাপ—সময়ের একক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সূর্য্যের আহ্নিক ও বার্ষিক গতি হইতে। অল্পকালের মাপ হয় ঘণ্টা ($\frac{১}{২৪}$ দিবস)কে কিংবা মিনিট সেকেণ্ডকে মাপকাঠি ধরিয়া, কিন্তু দীর্ঘকালের মাপ হয় বর্ষকে মাপকাঠি ধরিয়া। ইতিহাসের মাপকাঠি শতাব্দী, আবার ভূবিদ্যার মাপকাঠি দশলক্ষ বৎসর। এইরূপে নানা কার্য্যে হিসাবের সুবিধার জন্য মাপকাঠি ছোট বড় করা হয়।

পদার্থ-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

পদার্থ (Matter)

পদার্থের গুণ ও শ্রেণীবিভাগ

পদার্থ-বিদ্যা (Physics)—ইহার দ্বারা আমরা পদার্থের গুণ, শ্রেণী, ও পদার্থের উপর বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া জানিতে পারি।

পদার্থের প্রকার-ভেদ—পদার্থের প্রধানতঃ দুই ভাগ—চেতন ও জড়। জড় পদার্থ আবার তিন প্রকার—**কঠিন, তরল** ও **বায়বীয়**। ইট, কাঠ, লোহা কঠিন পদার্থ। জল, তেল, দুধ—তরল। ফুটন্ত জলের ভাপ ও আকাশের বাতাস—বায়বীয়।

তিন প্রকার জড়পদার্থের সাধারণ গুণ—

১। **ওজন** (Weight)—সকল পদার্থেরই ওজন আছে। যেমন ইট পাথরের আছে, তেল জলের আছে, তেমন বাতাস ও বাষ্পেরও আছে। কাহারও বেশী, কাহারও কম। শব্দ বা আলোকের ওজন নাই। তাহারা শক্তি, পদার্থ নয়।

২। **বিস্তৃতি** (Extension)—প্রত্যেক পদার্থই খানিকটা জায়গা দখল করিয়া থাকে। একদিকের মাপ লইলে দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ পাওয়া যায়, দুইদিকের মাপে পৃষ্ঠ (Surface), এবং তিন দিকের মাপে আয়তন (Volume) পাওয়া যায়। শব্দ বা আলোক জায়গা দখল করে না; তাহারা পদার্থ নয়।

৩। **অভেদ্যতা** (Impenetrability)—দুইটি পৃথক্ পদার্থ এক সঙ্গে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। কাঠে পেরেক মারিলে উহা ভিতরে ঢুকিয়া যায় বটে, কিন্তু কাঠ দুইদিকে সরিয়া গিয়া পেরেকের স্থান করিয়া দেয় ; কাঠ ও পেরেক একই স্থান দখল করে না। একটি খালি বোতল উপুড় করিয়া জলে চাপিয়া ধর, বোতলে জল ঢুকিবে না। কেন না, বোতলের ভিতরটা হাওয়ায় দখল করিয়া আছে। বোতল কাত কর, দেখিবে হাওয়া বুড় বুড় করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, জল ভিতরে ঢুকিতেছে।

৪। **নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তা** (Inertia)—কোন পদার্থই আপন হইতে চলিতে বা থামিতে পারে না। একটি বল পড়িয়া আছে, সে আপনা হইতে কখনও চলিবে না। ঠেলিয়া দিলে চলিবে, একবার চলিলে আবার তার আপন গতিনিরোধেরও ক্ষমতা নাই। তুমি বলটাকে একবার গড়াইয়া দিলে উহা খানিকটা গিয়া থামিবে বটে, কিন্তু সে ত নিজের শক্তিতে থামিল না! ভূমির ঘর্ষণ (friction) জনিত রোধশক্তির জোরে থামিল। চলন্ত গাড়ী হইতে নামিবার সময় সাবধান হইয়া না নামিলে কি হয়? যতক্ষণ গাড়ীর মধ্যে ছিলে গাড়ীর সমান গতি তোমার সকল অঙ্গেরই ছিল। এখন মাটিতে পা ঠেকিয়া হঠাৎ পায়ের গতি থামিয়া গেলে সম্মুখ দিকে পড়িবারই সম্ভাবনা।

৫। **মহাকর্ষ** (Gravitation)—পদার্থ মাত্রই সর্ব্বদা অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে। বিশ্ব-জগতের চেতন অচেতন সকল পদার্থই পরস্পরকে অবিরাম আকর্ষণ করিতেছে। তবে পৃথিবীর মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড আমাদের সকলকে টানিয়া রাখিয়াছে, তাই আমরা পরস্পরের ক্ষুদ্র আকর্ষণ অনুভব করি না,—কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়া

পালাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। পাখী বল, বেলুন বল, উড়ো জাহাজ বল, সকলকেই খানিকটা উড়িয়া, এই পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসিতে হয়। পাতা শুকাইলে, ফল পাকিলে, তাহারা যে মাটিতে পড়ে, সে পৃথিবী টানিতেছে বলিয়া। গাছ হইতে পাকা আপেল ফলের পতন দেখিয়া পণ্ডিতবর নিউটন মহাকর্ষের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমরা যাহাকে পদার্থের ওজন বলি তাহার কারণ হইল এই আকর্ষণ শক্তি। পদার্থটি যত জোরে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয় তাহাই তাহার ওজন। এই আকর্ষণের মাত্রা পৃথিবী হইতে পদার্থটির দূরত্বের উপর নির্ভর করে। পদার্থটি পৃথিবীর যত নিকটে থাকিবে ততই আকর্ষণ বেশী হইবে। একারণ একই পদার্থের ওজন সমুদ্রতীর অপেক্ষা পাহাড়ের উপর কম হইবে। পৃথিবীর কেন্দ্রে কোনও পদার্থ লওয়া সম্ভব হইলে তাহার ওজন থাকিত না।

৬। **বিভাজ্যতা** (Divisibility)—যে কোন কঠিন পদার্থ লইয়া তাহাকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বা কাটিতে কাটিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়। এক শিশি জল লইয়া তাহাকে জোরে ছড়াইয়া দিলে উহা সহস্র সহস্র জলকণাতে বিভক্ত হইয়া যায়। বায়বীয় পদার্থ ত আপনা হইতেই এইরূপ অসংখ্য খণ্ড হইয়া যাইতেছে। আগুন হইতে ধোঁয়া উঠিয়া কিরূপ ছড়াইয়া যায় সকলেই দেখিয়াছ। এক ফোঁটা লাল কালি এক গ্রাস জলে ফেলিলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই উহা সহস্রধা বিভক্ত হইয়া সমস্ত জলটাকে লালচে করিয়া দিবে।

৭। **স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity)—পদার্থ যেমন আছে, তেমনই থাকিতে চায়। এক খণ্ড রবার লইয়া দুই হাতে টান, বাড়িবে। ছাড়িয়া দাও, আবার যেমনকার তেমনই হইয়া যাইবে। তোমরা ইস্পাতের স্প্রিং নিশ্চয় দেখিয়াছ। বাঁকা স্প্রিংকে টানিয়া

ধরিলে সোজা হয়, ছাড়িয়া দিলে আবার গুটাইয়া যায়। বেতের ছড়িকে বাঁকাইয়া ধর বাঁকিবে, ছাড়িয়া দিলে আবার সোজা হইবে।

৮। **সচ্ছিদ্রতা** (Porosity)—পদার্থমাত্রই ঝাঁঝরা, তার অঙ্গে অসংখ্য ছিদ্র আছে। তবে সে ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চোখে না দেখিতে পাইলেও তার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ব্লটিং কাগজের সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ ছিদ্র আছে বলিয়াই তাহা কালি চুষিয়া লইতে পারে। টেবিলে কালি পড়িলে যে দাগ হয়, মুছিলেও যায় না, তাহাও কাঠে ছিদ্র আছে বলিয়াই।

৯। **সংসক্তি** (Cohesion)—সংসক্তি অর্থ চলিত কথায় আমরা যাহাকে বলি বাঁধুনি। এই সংসক্তি বা বাঁধুনির তারতম্য অনুসারে পদার্থের অবস্থাভেদ হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থে এই গুণ বেশী, জলীয় পদার্থে কিছু কম, ও বাষ্পীয় পদার্থে খুব কম। এইজন্য একখণ্ড বরফ, পাথর বা লোহা মাটির উপর রাখিয়া দিলে দাঁড়াইয়া থাকে, ছড়াইয়া পড়ে না। জল, তেল বা পারা রাখিলে তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া যায়। বাষ্পীয় পদার্থের ত কথাই নাই! আটক করিয়া না রাখিলে পালাইবে, আকাশে ছড়াইয়া পড়িবে।

১০। **রোধ** (Resistance)—পদার্থের আর এক গুণ রোধ। শক্ত পাথরের মেজের উপর ছড়ি দিয়া মার, তোমার হাতে লাগিবে, কিন্তু পাথর যেমনকার তেমনই থাকিবে। জলের উপর মার, কিছু বাধা পাইবে; কিন্তু জল দুই দিকে সরিয়া যাইবে, তরঙ্গ উঠিবে। বাতাসে ছড়ি ইচ্ছামত চালনা কর, বিশেষ কোন বাধাই পাইবে না। অর্থাৎ কঠিনের রোধ খুব বেশী, তরলের কম, বায়বীয়ের আরও কম।

তাহা হইলে দেখিতেছ যে সংসক্তি যেখানে বেশী রোধও সেখানে বেশী, সংসক্তি যত কম রোধও তত কম।

পদার্থের গুণ ও শ্রেণীবিভাগ

১১। **জড়ের অবিনাশিতা** (Conservation of mass)—জড়ের ধ্বংস নাই। স্থূলজ্ঞানে যাহাকে বস্তুর ধ্বংস বলিয়া মনে হয় তাহা বাস্তবিক ধ্বংস নহে, রূপান্তর মাত্র।

জড় পদার্থের গঠন (Structure of matter)—জড় পদার্থকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিলে ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়া পড়া যায় যে, সেই পদার্থের গুণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আরও বিভক্ত করা সম্ভব নয়। এইরূপ স্ক্ষ্মতম অংশ অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **অণু** (molecule)। এই অণু পদার্থভেদে ভিন্ন, অর্থাৎ জলের অণু ও তেলের অণু এক নয়। পাথরের অণু ও চিনির অণু এক নয়।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক জন ড্যালটন (John Dalton) অণু অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতম অংশের পরিকল্পনা করেন; তাহার নাম **পরমাণু** (Atom)। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে এই পরমাণুও প্রোটন (Proton), ইলেকট্রন (Electron) প্রভৃতির দ্বারা গঠিত।



৩। জন ড্যালটন

পরমাণু প্রায়ই একা থাকে না, দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলিত হইয়া একটি অণুর সৃষ্টি করে। আবাব একটি পদার্থ বহুসংখ্যক অণুর সমষ্টি। অণুগুলি কিন্তু পরস্পর সংলগ্ন নহে। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকে, এই ব্যবধানের নাম **আণবিক ব্যবধান** (intermolecular space)। আণবিক ব্যবধান এত সূক্ষ্ম যে কল্পনার অতীত।

অণুগুলির মধ্যে একটা আকর্ষণী ও একটা বিকর্ষণী শক্তি থাকে। জড় পদার্থ মাত্রেই এই দুই শক্তি সমান নয়। কঠিন পদার্থে আকর্ষণী শক্তি প্রবল, ও সেজন্য আণবিক ব্যবধান কম হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় পদার্থটি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে। তরল পদার্থে আকর্ষণী শক্তি অনেক কম। কাজেই উহার অণুগুলি সহজে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে। তরল পদার্থে আণবিক ব্যবধানও অপেক্ষাকৃত বেশী। বায়বীয় পদার্থে অণুর আণবিক ব্যবধান এত বেশী যে উহাদের আকর্ষণী শক্তি প্রায় কোনও কাজ করে না। তাহার জন্য বায়বীয় পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আয়তন বা আকার থাকে না।

পদার্থের স্বরূপ পরিবর্ত্তন—কোন কঠিন জড় পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার আণবিক বিকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় ও তাহার ফলে সেই পদার্থটি প্রথম তরল ও তাহার পর বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়। বায়বীয় পদার্থে শৈত্য প্রয়োগে উহা প্রথম তরল ও পরে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইহা বিকর্ষণী শক্তি কমিয়া যাওয়ার ফল মাত্র।

একই পদার্থ—কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিন অবস্থায় থাকিতে পারে। বরফ কঠিন; তাহাকে গলাও জল হইবে; জলকে ফুটাও, বাষ্প হইবে। অর্থাৎ উত্তাপ লাগিলে বরফ জল হইয়া যায়, জল বাষ্প হইয়া যায়। আবার জলীয় বাষ্প শীতল করিলে উহা জলে পরিণত হয়, এবং জল অত্যন্ত শীতল করিলে উহা বরফে পরিণত হয়। তাহা হইলে পদার্থের এই যে তিন অবস্থা ইহার মূলে রহিয়াছে উত্তাপ।

তিন প্রকার জড়পদার্থের বিশেষ গুণ—

(১) **কঠিন পদার্থ** বা শক্ত জিনিসের একটা নিজের আকার আছে। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ না করিলে সে আকারের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আকার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ইহার

উপর নানা রকমের শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। পাথর ভাঙ্গিতে হয়, কাঠ কাটিতে হয়, লোহা পিটিতে হয়, সূতা ছিঁড়িতে হয়। মোম কি গালাকে ভাঙ্গিতে বা পিটিতেও হয় না, আগুনের কাছে রাখিলেই তাহার আকার বদলাইয়া যায়।

(২) **তরল পদার্থের** নিজের কোন আকার নাই। যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এক ঘটি জলের আকার ঘটির মত। সেই জল গেলাসে ঢালিলে তাহার আকার হয় গেলাসের মত, বাটিতে ঢালিলে হয় বাটির মত।

(৩) **বায়বীয় পদার্থের**ও নিজস্ব আকার নাই। যে আধারে রাখিবে উহা সেই আধারের আকার ধারণ করিবে। তবে তরল পদার্থের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এক ঘটি জল ঘড়ায় ঢালিলে ঘড়া ভরিবে না, জলটা তাহার তলায় পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু বায়বীয় পদার্থ, যত অল্পই হউক না কেন, যে পাত্রে ঢালিবে তাহা ভরিয়া যাইবে। ঘটিতে ঢাল ঘটি ভরিবে, ঘড়াতে ঢাল ঘড়া ভরিবে, বদ্ধ ঘরে ছাড়িয়া দাও ত সে ঘর ভরিয়া যাইবে। বায়বীয় পদার্থ তাহা হইলে সর্ব্বদাই নিজকে ছড়াইয়া দিতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! কঠিন বা তরল পদার্থ অপেক্ষা ইহার সংনম্যতাও বেশী।

পাথর বা লোহার অর্থাৎ কঠিন পদার্থের উপর চাপ দাও, দেখিবে, তাহার আয়তন ছোট হইবে না। জলের অর্থাৎ তরল পদার্থের উপর চাপ দিলে আয়তন সামান্য একটু কম হইবে। কিন্তু বায়বীয় পদার্থের উপর চাপ দাও, দেখিবে যে যত চাপ পড়িবে আয়তন তত কমিবে, যেন তাহার অন্ত নাই। এই গুণকে **সংনম্যতা** (compressibility) কহে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যে পদার্থের সংসক্তি বেশী তাহার রোধও বেশী কিন্তু সংনম্যতা কম। যাহার সংসক্তি কম

তাহার রোধও কম, কিন্তু সংনম্যতা বেশী। সাইকেল বা মটর গাড়ীর টায়ার হাওয়ায় ভরা থাকে। হাওয়া অত্যন্ত সংনম্য বলিয়াই এই টায়ার এত আরামদায়ক, গাড়ীতে এত কম ঝাঁকি লাগে। নিরেট রবারের টায়ার ইহার অর্দ্ধেক আরামও দেয় না।

অনেক বায়বীয় পদার্থ বর্ণহীন ও অদৃশ্য। আমাদের নিকটতম বন্ধু বাতাস তাহার অন্যতম। কিন্তু অদৃশ্য হইলে কি হয়, এই বাতাসের কৃপাতেই ফুলের সুবাস আমাদের নাকে আসে, মধুর সঙ্গীতধ্বনি আমাদের কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের তুলনা:

কঠিন	তরল	বায়বীয়
১। ওজন আছে।	১। ওজন আছে।	১। ওজন আছে।
২। সহজে আয়তন বা আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না।	২। নিজস্ব আয়তন আছে, কিন্তু আকৃতি নাই। যে পাত্রে থাকিবে তাহারই আকৃতি ধারণ করিবে, কিন্তু আয়তন ঠিক থাকিবে।	২। নিজস্ব আয়তন বা আকৃতি নাই,—যে পাত্রে থাকিবে তাহারই আয়তন ধারণ করিবে।
৩। রাখিতে সাধারণতঃ পাত্রের বা আধারের প্রয়োজন নাই।	৩। খোলা আধারে রাখিতে পারা যায়।	৩। রাখিতে সাধারণতঃ বদ্ধ আধারের প্রয়োজন।
৪। চাপ দিলে আয়তনের বিশেষ হ্রাস হয় না।	৪। চাপ দিলে আয়তনের বিশেষ হ্রাস হয় না।	৪। চাপ দিলে আয়তনের হ্রাস হয়।
৫। অংশ বিচ্ছিন্ন করিতে জোরের প্রয়োজন।	৫। অংশ সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়।	৫। অংশ সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়।

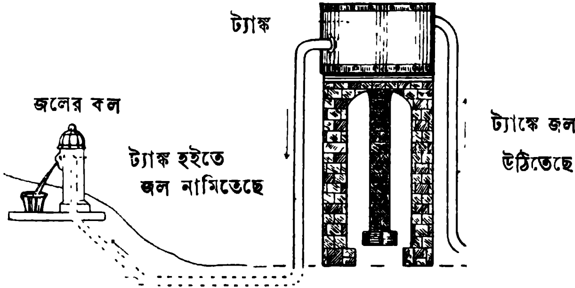
Questions

1. What are the general properties of matter? Why are sound and light not considered as material?
2. What are the three states of matter? Are they inter-convertible? Give an example.

জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম

(Physical properties of water)

জলের প্রয়োজনীয়তা—জীবের জীবন ধারণের জন্য জলের প্রয়োজন। পৃথিবীতে জলের অভাব নাই, কিন্তু সকল জল মানবের পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় না। জল যে শুধু পানীয়রূপেই আমরা ব্যবহার করি তাহা নহে, বিবিধ খাদ্যের সঙ্গে জল আমাদের শরীরে প্রবেশ লাভ করে।

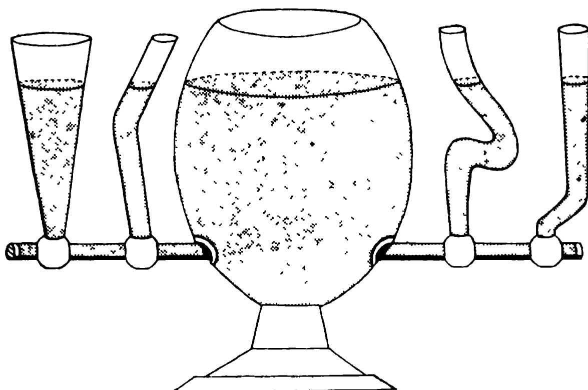


৪। জল সরবরাহ

জলের ধর্ম্ম—জলের নিজের কোন আকার নাই। সাধারণতঃ জল স্বচ্ছ, আলোকের পথে ইহা বাধা প্রদান করে না, কিন্তু তড়িৎ ও তাপশক্তি ইহার মধ্য দিয়া সহজে পরিচালিত হয় না। অল্প মাত্রায় জলের কোনও রং নাই, কিন্তু পরিমাণে বেশী হইলে ইহাকে নীলবর্ণ দেখায়। বিশুদ্ধ জলের কোন স্বাদ নাই, গন্ধ নাই।

জল বায়ুর ন্যায় সচল। ইহা গড়াইয়া চলে ও সর্ব্বদাই নীচের দিকে ধাবিত হয়। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে বা বড় রেল ষ্টেসনে একটি লোহার বা পাকা গাঁথুনীর মঞ্চের উপর একটি সুবৃহৎ

পাত্র বা ট্যাঙ্ক বসান থাকে (চিত্র ৪)। ট্যাঙ্কের উপর ও নীচের দিকে দুইটি মোটা নল লাগান থাকে। উপরের নলটির মধ্য দিয়া পাম্প সাহায্যে ট্যাঙ্কটি জলে পূর্ণ করা হয়। নীচের নল দিয়া বা আরও ছোট নল দিয়া ইচ্ছামত জল সর্ব্বত্র সরবরাহ করা হয়। জলের আর একটি ধর্ম্ম হইল উহার উপরিভাগ সর্ব্বদা সমতল। কখন উঁচু নীচু হইতে পারে না। পুকুরের তলদেশের সকল ভাগ সমান গভীর না হইলেও উহার জলের উপরিভাগ সমতল। গ্লাসে কতকটা জল লইয়া কাত করিলে দেখা যায় উহার ভিতরকার জলের উপরিভাগ সমতল।



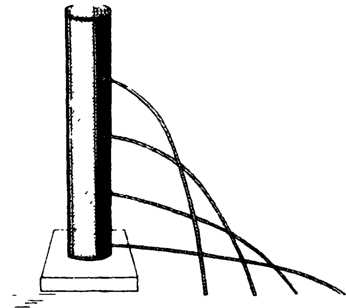
৫। সকল পাত্রেই জলের উচ্চতা সমান ও উপরিভাগ সমতল

বিভিন্ন আকারের কতকগুলি পাত্র একটা নল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া যদি একটিতে জল ঢালা যায় ত সকল পাত্রেই জল যাইবে এবং আধারের আকার অনুসারে জলের আকার হইবে। ইহা ছাড়া, সকল পাত্রেই জলের উচ্চতা একই হইবে।

জল ছাড়া অন্যান্য তরল পদার্থেরও উপরিলিখিত প্রায় সমস্ত ধর্ম্মই সমান।

জলের চাপ (Pressure of water)—জল বা তরল পদার্থ মাত্রই উর্দ্ধ, নিম্ন ও পার্শ্ব দিকে চাপ দিতে থাকে। জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশে যে চাপ পড়ে তাহাকে নিম্নচাপ ও পার্শ্বদেশে যে চাপ পড়ে তাহাকে পার্শ্বচাপ কহে। কূপের মধ্যে দড়ি বাঁধিয়া একটি বালতি ডুবান হইল। জলসমেত বালতি যতক্ষণ জলের নীচে থাকে ততক্ষণ দড়ি ধরিয়া টানিলে দেখা যায় কত হালকা, কিন্তু জল সমেত বালতি জলের বাহিরে আসিলেই খুব ভারী বোধ হয়। বালতি জলের মধ্যে টানিলে জলের উর্দ্ধচাপই বালতিকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দেয় ও উহা হালকা মনে হয়। অতএব জলে কোন বস্তু নিমজ্জিত করিলে তাহার উপর সকল দিক হইতেই জল চাপ দেয়।

জলের নিম্নচাপ (Downward pressure)—প্রত্যেক পদার্থের ন্যায় তরল পদার্থ নীচের দিকে চাপ দেয়। তরল পদার্থের নিম্নচাপের পরিমাণ উহার উচ্চতার ও ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে। উচ্চতা অর্থাৎ যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের মধ্যে তরল পদার্থের উচ্চতা বাড়াইলে নিম্নচাপ বাড়ে এবং উচ্চতা কমাইলে নিম্নচাপ কমে।

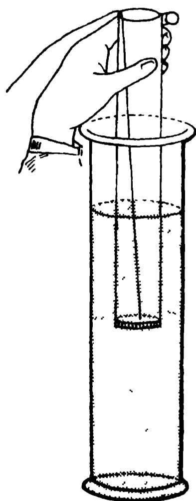


৬। জলের পার্শ্বচাপ

জলের পার্শ্বচাপ (Lateral pressure)—চারিটি ছিদ্রপূর্ণ একটি জলের পাত্রের ছিদ্রগুলি ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া উহার মধ্যে জল ঢালিয়া দাও। যে ছিদ্রটি সকলের নীচে অর্থাৎ জলের উপরিভাগের উচ্চতা যাহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেই ছিদ্রে

জলের চাপও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে। তাই ছিপিগুলি খুলিয়া দিলে সর্ব্বনিম্ন ছিদ্র দিয়া সকলের চেয়ে জোরে, সুতরাং সকলের চেয়ে দূরে জল পড়িবে।

জলের ঊর্দ্ধচাপ (Upward pressure)—সোজাভাবে হাঁড়ী বা কলসী জলে ডুবাইতে গেলে দেখা যায় যে জল হাঁড়ী বা কলসীর তলায় উপর দিকে চাপ দেয় অর্থাৎ হাঁড়ী বা কলসীকে জলে সোজাভাবে ডুবাইতে কষ্ট হয়। এই ঊর্দ্ধচাপও জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে।


৭। জলের ঊর্দ্ধচাপ

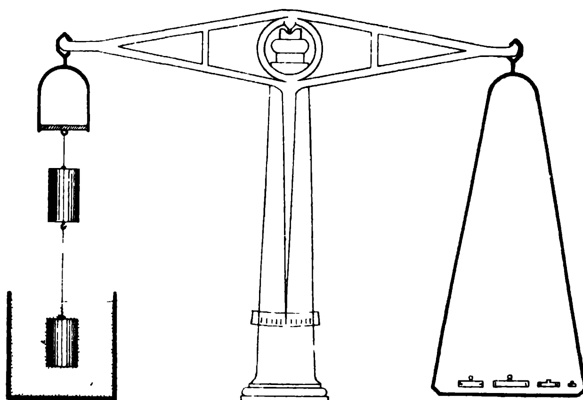
জলের ঊর্দ্ধচাপের পরীক্ষা—একটি কাচের চোঙের একমুখ একটি টিনের চাকৃতি দিয়া বন্ধ কর। এই চাক্‌তিটির কেন্দ্রে যেন একটি আংটি লাগান থাকে যাহাতে একটু সূতা বাঁধিতে পারা যায়। চাকৃতিটির সূতা চোঙের মধ্য দিয়া আনিয়া বাহির হইতে ধরিয়া রাখ। চাকৃতি সমেত চোঙটি জলের মধ্যে ঢুকাইতে চেষ্টা কর। দেখিবে বেশ জোর লাগিতেছে।

এখন চাকৃতির সূতা ছাড়িয়া দিলেও চাকৃতি পড়িয়া যায় না। চোঙের ভিতর জল নাই। কেবল জলের উপর দিকের চাপের ফলে চাকৃতি পড়িয়া যায় না। তারপর চোঙটিতে জল ঢাল। যেই চোঙের ভিতরের জল ও চোঙের বাহিরের জল এক সমতলে আসিবে, অর্থাৎ চোঙমধ্যস্থ জলের নীচের দিকে চাপ ও চোঙের বাহিরের জলের উপর দিকে চাপ এক হইবে অমনি চাকৃতি চোঙ

হইতে খসিয়া বাহিরের পাত্রস্থ জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। চাক্তির উপর চোঙের বাহিরের জলের ঊর্দ্ধচাপ এবং ভিতরের জলের নিম্নচাপ সমান হইবার ফলে মহাকর্ষের জন্য উহা জলের তলায় পড়িয়া যাইবে।

প্লবতা ও আর্কিমিডিসের তথ্য

জলের প্লবতা (Buoyancy of water)—একখানা ইট এক হাতে তুলিতে হইলে বেশ একটু জোর লাগে। সেই ইট জলের মধ্যে তুলিয়া ধর, মনে হইবে কোন জোরই লাগিতেছে না। এমন কি, তিন চারিখান ইটও অক্লেশে জলের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে পারিবে।



৮। প্লবতা পরীক্ষা

এরূপ হইবার কারণ এই যে জল সেই ইটগুলিকে নীচে হইতে চাপ দিতেছে অর্থাৎ ঠেলিতেছে। এই চাপকেই **প্লবতা** (buoyancy) বলে। সকল তরল পদার্থেরই এই গুণ আছে।

প্লবতা পরীক্ষা—(১) একটি দাঁড়িপাল্লার একদিকে দুইটি সমান আকারের স্তম্ভক আছে (চিত্র ৮)। উপরেরটি ফাঁপা এবং নীচেরটি নীরেট। স্তম্ভক দুইটি প্রথমে ওজন করিয়া লইয়া নীচের স্তম্ভকটি জলে ডুবাইয়া দাও ও ওজন লও, দেখিবে এবারে ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে। এখন ফাঁপা স্তম্ভকটি জলপূর্ণ করিয়া লইলে দেখিবে ওজন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে।

(২) একটা তুলাদণ্ড বা দাঁড়িপাল্লার একদিকে সূতা দিয়া এক টুকরা পাথর বাঁধিয়া তাহা সযত্নে ওজন কর। পরে সেইটি ঐ অবস্থায় এক বালতি জলে ডুবাইয়া রাখ ও আবার ওজন কর। দেখিবে ওজন অনেক কমিয়া গেল। এখন পাথরটুকরাটিকে এক নলওয়ালা জলসমেত পাত্রে ডুবাও যাহাতে নলের তলার দিক জলের সহিত সমান্তরাল থাকিবে। ডুবাইবামাত্র নল দিয়া খানিকটা জল বাহির হইয়া আসিবে। এই জল একটি গেলাসে ধরিয়া ওজন কর। দেখিবে এই জলের ওজন ও পাথরটুকরাটি জলে ডুবানর দরুণ ওজনের যে হ্রাস হইয়াছিল এই দুই ওজন সমান।

উপরের দুইটি পরীক্ষা হইতে দেখা গেল যে, কোন পদার্থ জলে ডুবাইলে তাহা যে আয়তনের জল সরাইয়া দেয় পদার্থটি সেই আয়তন জলের ওজন হারায়। এই সত্যটি বৈজ্ঞানিক-প্রবর আর্কিমিডিস প্রথম আবিষ্কার করেন। সেই হইতে ইহা **আর্কিমিডিসের সূত্র** (Archimedes' principle) নামে খ্যাত।

ওজনের বিশেষ অর্থ—পৃথিবী যে পদার্থকে যত জোরে আকর্ষণ করিতেছে সেই জোর হইল তাহার ওজন। জলে ওজন কমিল কেন? পৃথিবীর আকর্ষণ নীচের দিকে, আর জলের প্লবতা উপর দিকে।

দুইটি শক্তির পরস্পর যুদ্ধ বাধিল। যদি নিমজ্জিত পদার্থটি ভাসিয়া উঠে, তাহা হইলে প্লবতাশক্তির জয় হইল। যদি ভাসিয়া না উঠে, তবে মহাকর্ষের জয় হইল। কিন্তু সে পদার্থ ভাসুক বা না ভাসুক, তাহার ওজন কমিবেই। এই ওজন কম থাকিবে ততক্ষণ যতক্ষণ সে জলে আছে। বাহিরে তুলিলেই আবার তাঁহার ওজন পূর্ব্ববৎ হইবে, অর্থাৎ পৃথিবী আবার পূরা জোরে তাহাকে টানিবে।

প্লবতাশক্তি ও সাঁতার--জাহাজ, নৌকা, ডিঙি, ভেলা, যে জলে ভাসে তাহা জলের এই প্লবতাশক্তির প্রভাবে। তোমরা যে সাঁতার দাও তাহাও এই শক্তির সাহায্যে। জন্তুর দেহ সমান ঘনায়তনের জলের চেয়ে হালকা, তাই জলের প্লবতাশক্তি তাহাকে ভাসাইয়া রাখিবে। কুকুর, বিড়াল, গরু সেই জন্য স্বচ্ছন্দে সাঁতরাইয়া বেড়ায়। কিন্তু তোমাদের সাঁতার শিখিতে হয় কেন, জান? তোমরা মানুষ, তোমাদের বুদ্ধি বেশী, মাথার ভিতর মগজের সম্ভার, সেজন্য মাথাটা ভারী, সমান ঘনায়তনের জলের চেয়ে সামান্য বেশী। পুকুরে পড়িলে স্বাভাবিক নিয়মে তোমার মাথা জলের মধ্যে চলিয়া যাইবে। জলের প্লবতাশক্তি মাথাটাকে ভাসাইয়া রাখিতে পারিবে না। মাথা জলে ডুবিলে নাকে মুখে জল ঢুকিয়া দম বন্ধ হইয়া যাইবে। সাঁতার শেখা অর্থ মাথা তুলিয়া ধরিয়া ভাসিবার কৌশল শেখা। জানোয়ার বেচারাদের অত বুদ্ধির বালাই নাই, মগজ কম, সেকারণ মাথা হালকা। আপন হইতে মাথা ভাসে।

সমুদ্রের জলে লবণ গোলা থাকায় উহার ওজন বেশী। সেই জন্য সমুদ্রে সাঁতার শেখা বা দেওয়া সহজ। ডেড্ সী নামক এক হ্রদ আছে। তাহার জলে লবণের পরিমাণ এত বেশী ও জল এত ভারী যে, সেখানে তুমি চেষ্টা করিলেও ডুবিতে পারিবে না।

এক বাটি জলে একটা হাঁসের বা মুরগীর ডিম ছাড়িয়া দাও। ডিম ডুবিয়া যাইবে। সেই জলে দুই চামচ লবণ মিশাইয়া দাও, দেখিবে ডিম ভাসিয়া উঠিতেছে। ইহার অর্থ কি? জল সমান ঘনায়তনের ডিমের চেয়ে হালকা, কিন্তু লোনা জল ডিমের চেযে ভারী।

প্লবতা ও ওজন (Buoyancy and weight)—প্লবতা সকল তরল পদার্থেরই আছে। তবে যে তরল পদার্থ যত ভারী, তাহার প্লবতাও তত বেশী। প্লবতা নির্ভর করে যেমন ভাসমান দ্রব্যের গুরুত্বের উপর, তেমনই যে তরল পদার্থে ঐ দ্রব্যকে ডুবাইতেছ তাহার গুরুত্বের উপরও। এই জন্য লোহা পারদে ভাসে।

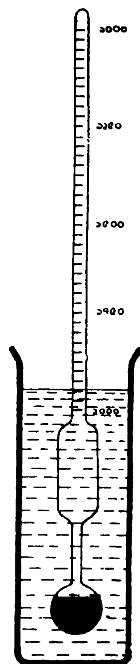
জল অপেক্ষা হালকা জিনিস জলে ভাসে। কিন্তু ভাসিবার সময় তাহার কতটা জলে ডুবিয়া থাকিবে, বলিতে পার? ইহার একটা নিয়ম আছে। ভাসমান পদার্থ যতটা জলকে স্থানচ্যুত করিয়াছে তাহার ওজন ও ভাসমান পদার্থ টার ওজন এক হইবে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity)—আপেক্ষিক গুরুত্ব অর্থ জলের তুলনায় গুরুত্ব। যদি বলা যায়, পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব সাড়ে তের, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এক পেয়ালা পারদের ওজন সাড়ে তের পেয়ালা জলের ওজনের সমান।

লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব আট অর্থ এই যে এক সের লোহার আয়তন এক সের জলের আয়তনের আট ভাগ। তেমনই সম আয়তনের লোহা ও জল লইয়া ওজন করিলে দেখিবে লোহার ওজন জলের আট গুণ। কোন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করিবার নানা উপায় আছে।

হাইড্রোমিটার—যে যন্ত্র সাহায্যে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা হয় তাহাকে হাইড্রোমিটার কহে।

এই যন্ত্রের তিন ভাগ। নীচের ভাগটি পারদভরা একটি ছোট পাত্র। মধ্য ভাগটি ফাঁপা মোটা একটি নল। উপর ভাগটি একটি সরু নল। যন্ত্রটি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, জলে ছাড়িয়া দিলে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগটি জলমধ্যে ডুবিয়া থাকে, শুধু উপরের সরু নলটির খানিকটা বাহিরে জাগিয়া উঠে। যন্ত্রটিকে জলে ভাসাইলে যতটা বাহিরে থাকিবে, তেলে ভাসাইলে ততটা থাকিবে না, কেন না তেল জল অপেক্ষা লঘু। লোনা জলে ভাসাইলে বেশী বাহির হইয়া থাকিবে। দুধে ভাসাইলেও বেশী বাহির হইবে। ইহার কারণ এই যে দুধ ও লোনা জল, জল অপেক্ষা ভারী। এইরূপে বিভিন্ন তরল পদার্থে যন্ত্রটিকে ভাসাইয়া তাহার নল যেখান যেখান পর্য্যন্ত ডোবে সেই সেইখানে এক একটি দাগ কাটিয়া লওয়া হয়। এই সমস্ত তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব সোজাসুজি ওজন করিয়া আগেই হিসাব করা আছে।



৯। হাইড্রোমিটার

যন্ত্রে দাগ কাটা হইলে পরে যে কোন অজানা তরল পদার্থে এই যন্ত্র ভাসাইলে তাহার আপেক্ষিক-গুরুত্ব সহজেই বাহির হইবে। এক অজানা তরল পদার্থে হাইড্রোমিটার ভাসাইলে, যেখান পর্য্যন্ত ডুবিল সেখানটা জলের দাগ ও দুধের দাগের মাঝামাঝি। তাহা হইলে বুঝা গেল যে অজানা পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব দুধের চেয়ে কম এবং জলের চেয়ে বেশী। দুধ খাঁটি কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য এই হাইড্রোমিটারেরই রকমারি এক যন্ত্র আছে, তাহার নাম

লাক্টোমিটার। তাহাকে দুধে ভাসাইলে, দুধে কতটুকু জল আছে তাহা অবধি ধরা পড়ে।

সাধারণতঃ হাইড্রোমিটারের দাগগুলির পার্শ্বে যে সংখ্যা থাকে তাহা আপেক্ষিক গুরুত্বের সহস্রগুণ। অর্থাৎ যদি কোন তরল পদার্থে হাইড্রোমিটার ১৫০০র দাগ পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব দেড় (১'৫) মাত্র।

জাহাজ জলে ভাসিবার কারণ—যে কোনও জিনিস জলে ডুবিলে বুঝিতে হইবে যে উহার ওজন সম আয়তন জলের ওজনের চেয়ে বেশী। আর যদি না ডোবে ত বুঝিতে হইবে যে উহার ওজন সম আয়তন জলের ওজনের চেয়ে কম। নিরেট লোহার বল জলে ডোবে, কিন্তু সেই বলকে পিটিয়া কড়াই তৈয়ার করিলে ভাসে। লৌহনির্ম্মিত প্রকাণ্ড জাহাজের ভিতরটা ফাঁপা। ইহা সম আয়তন জলের ওজন অপেক্ষা হালকা, সে কারণ জলে ভাসিয়া থাকে।

আর্কিমিডিসের তথ্যাবিষ্কারের গল্প—প্রায় তুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হায়েরো সিসিলি দ্বীপের রাজা ছিলেন। একদা তিনি এক তাল খাঁটি সোনা এক কারিগরের হস্তে দিয়া আদেশ করিলেন, এই সোনা দ্বারা আমার জন্য এক মুকুট গড়িয়া আন। যথা-সময়ে কারিগর এক আশ্চর্য্য মুকুট লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইল। নৃপতি মুকুটের রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন, কিন্তু সোনার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁহার কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু মুকুট না ভাঙ্গিয়া এ সন্দেহের সমাধান কিরূপে হইতে পারে? পণ্ডিতবর আর্কিমিডিসের কাছে মুকুট পাঠান হইল। তিনি মুকুট হাতে লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলেন না যে উহাকে না ভাঙ্গিয়া কি করিয়া বলিবেন, সোনায় খাদ মেশান আছে কি না।

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছুই হয় না। তারপর একদিন চৌবাচ্চায় স্নান করিতে করিতে আর্কিমিডিসের মাথায় চকিতের মত আলোক উদ্ভাসিত হইল। তিনি "ইউরেকা! ইউরেকা!" ("পেয়েছি! পেয়েছি!") বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে চৌবাচ্চা হইতে বাহির হইলেন। এত সহজ উপায়! জলে মুকুটটি ডুবাইলেই ত সব বুঝা যাইবে।



১০। আর্কিমিডিস

তোমরা বলিতে পার সেই পণ্ডিতবর কি সহজ উপায় দেখিলেন? মুকুটের ওজন ত লওয়াই ছিল। জলের মধ্যে ঝুলাইয়া পুনঃ তাহার ওজন লইলে বুঝা যাইবে কতটা ওজন কমিল। যতটা কমিল, সেটা মুকুটের সমান আয়তন জলের ওজন—অর্থাৎ যতটা জল সরাইয়া মুকুট জলমধ্যে আপন স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহার ওজন। ইহাই আর্কিমিডিসের আবিষ্কৃত তথ্য। হঠাৎ এই তথ্য মাথায় আসাতেই তিনি "ইউরেকা" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

এখন তাহা হইলে মুকুটের ওজন পাইলে, তাহার সমান আয়তন জলেরও ওজন পাইলে। প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি দিয়া ভাগ করিলে মুকুট যে ধাতু দিয়া নির্ম্মিত তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পাইবে। যদি খাঁটি সোনা হয় ত ভাগফল হইবে উনিশ, যদি খাদ মেশান থাকে ত ফল হইবে আরও কম, কেন না অন্য সাধারণ ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব সোনা অপেক্ষা কম।

এই উপায়ে সকল কঠিন পদার্থেরই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়।

Questions.

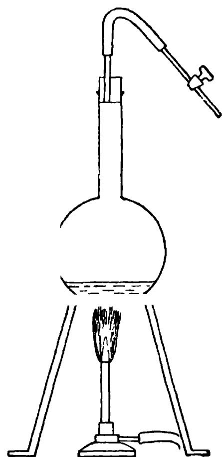
1. State the physical properties of water. How is water supplied in cities?
2. How would you show that water exerts pressure (*a*) downwards, (*b*) sideways and (*c*) upwards?
3. Explain the principle of Archimedes.
4. What is specific gravity?
5. Why does a big ship float in water?

বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম

বায়বীয় পদার্থের নিজস্ব গুণ—পূর্ব্বে তরল পদার্থের যে সকল সাধারণ গুণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা বায়বীয় পদার্থ সম্বন্ধেও সত্য। বায়ু বায়বীয় পদার্থের অন্যতম। ইহা অদৃশ্য; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব আমরা নানা প্রকারে বুঝিতে পারি। বায়ু প্রবাহিত হইলে ইহার স্পর্শ আমরা ত্বগেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি। ইহার অভাব হইলে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। ইহারই সাহায্যে আমরা শব্দ শুনিতে পারি, সুগন্ধের ঘ্রাণ পাই। ইহারই সঞ্চরণের ফলে ঝড়, ঘূর্ণিবায়ু ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনাবলী জগতে ঘটে। ঘরের আসবাব ছাড়া বাকী স্থান শূন্য মনে হইলেও উহা বায়ুতে পূর্ণ। বায়ু-সমুদ্রে আমরা ডুবিয়া আছি। আমরা দেখিতে না পাইলেও বায়ু নামক একটি স্বতন্ত্র পদার্থ যে আছে—লোহা, কাঠ, পাথরের মতই আছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই স্থিতিস্থাপক।

বায়ুর ওজন—পদার্থ হইলেই তাহার ভার বা গুরুত্ব থাকিতে হইবে। অতএব বায়ুরও অন্য পদার্থের ন্যায় একটা ওজন আছে, ইহা মানিতেই হইবে, কথাটা বিশ্বাস করা যতই কঠিন হউক।

বায়ুর ওজন সম্বন্ধে পরীক্ষা—একটি কাচের কুপী বা ফ্লাস্কের মুখে রবারের ছিপি আঁটিয়া দাও। ছিপিতে ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটি কাচের নল পরাইয়া দাও। নলের বাহিরের মুখে একটি রবারের নল লাগাও ও রবারের নলের মুখে একটি কাচের ছিপিযুক্ত নল আটকাইয়া রাখ। তার পর ফ্লাস্কের মধ্যে খানিকটা জল ঢালিয়া তাহাকে ফুটাও। যখন জলের বাষ্প রবারের নল দিয়া বেশ জোরে বাহির হইয়া আসিতেছে দেখিবে, তখন ছিপি আঁটিয়া দিয়া ফ্লাস্কটি নামাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা কর। বুঝিতে পারিতেছ ত যে ফ্লাস্কের মধ্যে আর হাওয়া নাই, জলের ভাপ সমস্ত হাওয়াকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। ফ্লাস্কটি যত্নপূর্ব্বক ওজন কর ও ওজন লিখিয়া রাখ। এইবার ছিপি খুলিয়া দাও। শব্দ করিয়া বায়ু ফ্লাস্কে ঢুকিবে ও মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহাকে ভরিয়া ফেলিবে; এখন পুনরায় ওজন কর, দেখিবে যে ফ্লাস্কের ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। যতটা বাড়িয়াছে তাহা পাত্রস্থ বায়ুর ভার, নহিলে বাড়িল কিরূপে!



১১। বায়ুর ওজন সম্বন্ধে পরীক্ষা

বায়ুমণ্ডল ও উহার চাপ

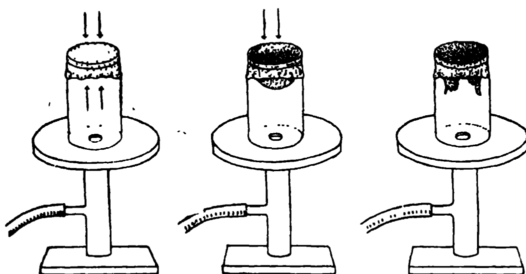
(Atmosphere and its Pressure)

ভূপৃষ্ঠ যে বায়ুর আবরণে আবৃত উহার নাম বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের নানা স্তর। নীচের স্তরের বায়ু উপরের স্তরস্থিত বায়ু অপেক্ষা ভারী।

বায়ুমণ্ডলের সমগ্র বায়ু পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট, সে কারণ বায়ু পৃথিবীকে আবেষ্টন করিয়া আছে।

বায়ুর নিজস্ব চাপ সম্বন্ধে পরীক্ষা—বায়ু সকল দিকে চাপ দেয়। সব দিকে সমান চাপ বলিয়া, বায়ুমণ্ডলের চাপ বাহিরে বুঝা যায় না।

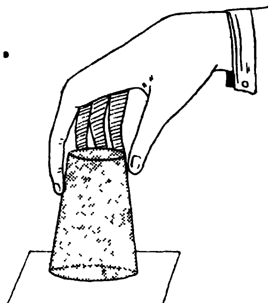
(১) **বায়ুর নিম্নচাপ** (Downward pressure of air)—একটি কাচের চোঙ বাত পাম্পের প্লেটের উপর রাখ। প্লেট ও চোঙের নীচের কিনারায় ভেসিলিন দিয়া আটকাইয়া দাও যাহাতে



১২। বায়ুর নিম্ন চাপের পরীক্ষা

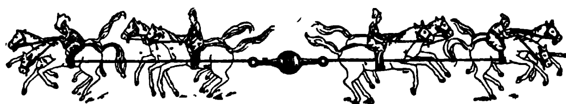
বায়ু প্রবেশের ফাঁক না থাকে। চোঙের খোলা মুখটি পাতলা রবারের চাদর দিয়া মুড়িয়া দাও। তার পর পাম্প চালাইয়া চোঙটি বায়ুশূন্য করিতে চেষ্টা করিলে প্রথমে রবারের চাদর চোঙের ভিতরের দিকে যাইতে চেষ্টা করিবে ও শেষে সশব্দে ফাটিয়া যাইবে। ইহার কারণ এই পাম্প চালাইবার পূর্ব্বে রবার চাদরের উপরে ও নীচে বায়ুর সমান চাপ ছিল। পাম্প চালাইলে চোঙের ভিতরটা বায়ুশূন্য হওয়ায় উপরের বায়ুর নিম্নচাপে রবার ফাটিয়া গেল।

২। **বায়ুর ঊর্দ্ধচাপ** (Upward pressure of air)—একটি কাচের গেলাস কাণায় কাণায় জলে ভরিয়া তাহার উপর এক টুকরা ভিজা কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দাও। এমনভাবে ঢাকিবে যে কোথাও না ফাঁক থাকে। এখন কাগজের উপর হাত চাপিয়া ধীরে ধীরে গেলাস উল্টাইয়া ধর। আস্তে আস্তে কাগজের উপর হইতে হাত সরাইয়া লও। দেখিবে, কাগজও সরিবে না, জলও পড়িবে না। বায়ুর চাপ কাগজকে ঠেলিয়া রাখিবে।



১৩। বায়ুর ঊর্দ্ধচাপের জন্য গ্লাস উপুড় করিলেও জল পড়িতেছে না

৩। **বায়ুর সর্ব্বদিকের চাপ** (Pressure from all directions)—মাগডিবার্গ অর্দ্ধগোলক বলিয়া এক যন্ত্র আছে। উহা দ্বারা বায়ুর চাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। যন্ত্রটি গোল পানের



১৪। মাগডিবার্গ অর্দ্ধগোলক লইয়া গ্যেরিকের পরীক্ষা

ডিবার মত, দুই ভাগে বিভক্ত, আঁটিয়া দিলে কোথাও ফাঁক থাকে না। এক স্থানে একটি ছিদ্র আছে। উহাকে ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যায়। দুই গোলার্দ্ধে হাতল লাগান আছে। হাতল ধরিয়া টানিলে দেখিবে সহজেই খুলিয়া আসিবে। এখন শোষক যন্ত্র বা পাম্প

লাগাইয়া ছিদ্রপথে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া লইয়া ছিদ্র পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া দাও। তারপর হাতল ধরিয়া দুইজনে পূরা জোরে টানাটানি কর। কিছুতেই খুলিবে না। কেন না, বাহিরে বায়ুর চাপ দুইজনের সমবেত শক্তি অপেক্ষাও অনেক বেশী। এইবার ছিদ্র খুলিয়া দাও। ভিতরে বায়ু প্রবেশ করুক ; দেখিবে গোলার্দ্ধ দুইটি আগের মত সহজেই খুলিয়া আসিবে। কেন না, এখন ভিতরে ও বাহিরে দুই দিকেই বায়ুর চাপ। এই পরীক্ষাটি যিনি করিয়াছিলেন তাঁহার নাম **গ্যেরিকে** (Guericke)।



১৫। গ্যেরিকে

বায়ুর চাপের পরিমাণ—পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রতি বর্গ-ইঞ্চি (এক ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া) স্থানের উপর বায়ুর চাপ প্রায় সাড়ে সাত সের। এই হিসাবে আমাদের সমস্ত দেহের উপর আমরা সর্ব্বক্ষণ কিঞ্চিদধিক সওয়া চারি শত মণ চাপ বহন করিতেছি ! মানুষ বিশ ত্রিশ ফুট জলের নীচে ডুব দিলে তার কষ্ট বোধ হয় ! জলের ভার যেন তাহাকে চাপিয়া ধরে। কিন্তু সমুদ্রের গভীর জলে শত শত ফুট নীচে কত মৎস্যাদি প্রাণী অবাধে বিচরণ করিতেছে ! সবই অভ্যাসের কথা। ঐ সমস্ত মৎস্যের দেহ গভীর জলের ভীষণ চাপ সহ্য করিবার মত করিয়া গঠিত। গভীর জলের কোন কোন মাছ ডাঙায় তুলিলে তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া মরিয়া যায়। কেন না, তাহারা এত বেশী চাপে বাস করিতে অভ্যস্ত যে, বায়ুর চাপ কমিলে তাহাদের দেহ ফুলিয়া উঠিতে বাধ্য। উপর

আকাশে বায়ু অনেক পাতলা ও তাহার চাপও অনেক কম। সেই জন্য বহু উর্দ্ধে উঠিলে কম চাপে মানুষেরও গা ফাটিয়া রক্ত পড়ে। একটা কথা মনে রাখিও যে বায়ুর চাপ আমাদের দেহের উপর চতুর্দ্দিক হইতে পড়িতেছে। তাহা ছাড়া, আমাদের দেহগহ্বরেও যথেষ্ট বায়ু আছে। অতএব চাপ চারিদিকে—বাহিরেও চাপ, ভিতরেও চাপ। এই সব কারণে আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি না।

দুই মুখ খোলা নল জলে ডুবাইলে কি হয় তাহার কথা উপরে বলিয়াছি। বাহিরে যতটা জল ভিতরেও ঠিক ততটা জল উঠিবে। এখন যদি নলের বাহিরের মুখে মুখ লাগাইয়া শোষণ কর ত দেখিবে যে জল উঠিয়া তোমার মুখের মধ্যে আসিবে। এরূপ কেন হয়? তোমার মুখ দিয়া তুমি নলমধ্যস্থ বায়ু শুষিয়া লইলে তাহাতেই বাহিরের বায়ুর চাপে জল তোমার মুখ অবধি উঠিয়া আসিল। তোমার হাতের কোনও মাংসল জায়গায় মুখ লাগাইয়া যদি শোষণ করিয়া বায়ু সরাইয়া দাও, দেখিবে যে সেখানটা ফুলিয়া উঠিবে। বেশীক্ষণ শোষণ কর ত রক্ত বাহির হইবে।

বায়ুর চাপ সম্বন্ধে গ্যালিলিওর পর্য্যবেক্ষণ —সেকালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্যালিলিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে পাম্প লাগাইয়া জল তুলিতে চেষ্টা করিলে জল চৌত্রিশ ফুটের উপর কিছুতেই উঠে না। গ্যালিলিও ইহার কারণ স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে সেই কারণ নির্ণীত হইয়াছে। বায়ুর চাপের অর্থ আমাদের মাথার উপর পঁচিশ ক্রোশ পুরু বায়ুমণ্ডলের ভার। এক বর্গ-ইঞ্চির উপর সেই ভার সাড়ে সাত সের। তাহা হইলে এক বর্গ-ইঞ্চির উপর যতটা উঁচু জল সাড়ে সাত সের ওজনের

হইবে ততটা জলকেই বায়ুর চাপ ধরিয়া রাখিতে পারিবে, তাহার বেশী নহে।



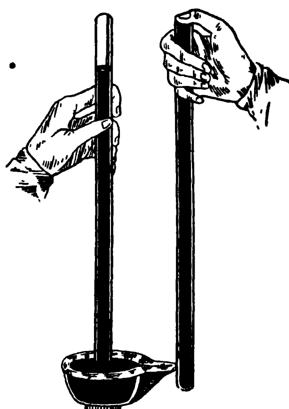
১৬। গ্যালিলিও

বায়ুর চাপ সম্বন্ধে টরিসেলির আবিষ্কার—গ্যালিলিওর শিষ্য টরিসেলি (Torricelli) বিষয়টি আলোচনা করিয়া নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, পাম্পের দ্বারা চৌত্রিশ ফুট জল উঠিবে বলিয়া সব তরল পদার্থ কিন্তু চৌত্রিশ ফুট উঠিবে না। কতটা উঠিবে নির্ভর করিতেছে সেই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর। পারদের ওজন জলের সাড়ে তের গুণ। পারদ উঠিবে মাত্র ত্রিশ ইঞ্চি। এই তথ্য হইতেই সৃষ্টি হইল চাপমান যন্ত্র।

চাপমান যন্ত্র (Barometer)—একমুখবন্ধ বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা একটা কাচের নল পারা দিয়া ভরিয়া ফেল। তারপর খোলা মুখটা আঙ্গুল দ্বারা বন্ধ করিয়া একপাত্র পারার ভিতরে উল্টাইয়া দাও। আঙ্গুল সরাইয়া লইলে দেখিবে যে খানিকটা পারা নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু কম-বেশী ত্রিশ ইঞ্চি পারা নলের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাত্রের পারার উপর যে পঁচিশ ক্রোশ বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়িতেছে, সেই চাপই পাত্রস্থ পারদের মধ্য দিয়া উর্দ্ধদিকে পরিচালিত হইয়া নলমধ্যে ত্রিশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের পারদস্তম্ভ তুলিয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং ঐ পারদ স্তম্ভের ওজন বাতাসের চাপের সমান। ইহাই হইল

টরিসেলির আদি চাপমান যন্ত্র বা ব্যারমিটার। বলা বাহুল্য যে, পারদের বদলে সমান লম্বা জলপরিপূর্ণ নল লইয়া জলের উপর উল্টাইয়া ধরিলে উহা হইতে একটুও জল পড়িবে না।

ব্যারমিটারের ব্যবহার—বায়ু-চাপের পরিমাপের জন্য ব্যারমিটার ব্যবহৃত হয়। বায়ুর চাপ প্রধানতঃ দুই কারণে কম-বেশী হয়। প্রথম কারণ, স্থানের উচ্চতা। যত উপরে যাইবে, বায়ু স্বভাবতঃ তত হালকা হইবে, তাহার চাপ তত কমিবে। সুতরাং কলিকাতা অপেক্ষা রাঁচিতে বায়ুর চাপ কম, রাঁচি অপেক্ষা দার্জ্জিলিংয়ে কম, দার্জ্জিলিং অপেক্ষা তিব্বতে আরও কম। যত উচ্চে যাইবে, ব্যারমিটারের পারাও তত নামিবে। অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে পারার স্তম্ভের উচ্চতা দেখিয়া পৃথিবীর যে কোন স্থানের উচ্চতা নির্দ্ধারণ করা যায়। উড়োজাহাজ চালাইতে হইলে উচ্চতার নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক এবং সেখানেও ব্যারমিটার সাহায্যেই উচ্চতা নির্ণীত হয়।



১৭। ব্যারমিটার

বায়ুর চাপ কম-বেশী হইবার দ্বিতীয় কারণ এই,—বায়ু নানা উপাদানে গঠিত, জলের বাষ্প তাহার অন্যতম। এই বাষ্প অপেক্ষাকৃত হালকা জিনিস। ইহার ভাগ বৃদ্ধি পাইলে বায়ুর গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। ভার কমিলেই চাপ কমিল। চাপ কমিলেই আর ত্রিশ ইঞ্চি পারার স্তম্ভকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। তোমার ব্যারমিটারে

পারা নামিয়া যাইবে। গরম বাতাসে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে। গরম বাতাসের চাপ কম। শীতল বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে। উহার চাপ বেশী। একদিন কলিকাতার আবহাওয়া আফিসে ব্যারমিটার দ্রুত নামিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আবহাওয়া আফিসের অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ দ্রুত বাড়িতেছে। অর্থাৎ শীঘ্রই ঝড় তুফানের সম্ভাবনা। তিনি বন্দরে বন্দরে তার করিয়া খবর দিলেন। মাঝি মাল্লাদের সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। জাহাজে কাপ্তেনের নিকটেই ব্যারমিটার থাকে। সেই যন্ত্র দেখিয়া তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন কখন বিপদের আশঙ্কা আছে। সময় থাকিতে সাবধান হইতে পারেন। অতএব, ব্যারমিটারের উপকারিতা কত বেশী তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতেছ।

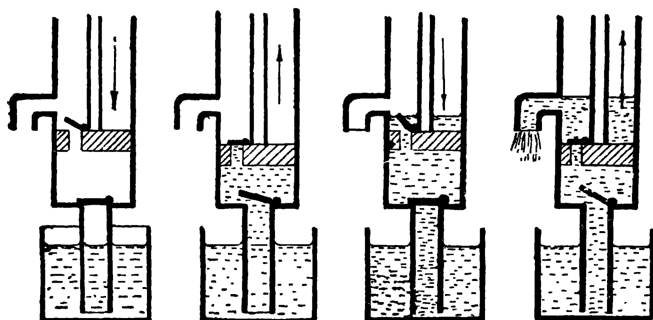
বায়বীয় পদার্থের চাপ ও আয়তনের পরস্পর সম্বন্ধ—কোন বায়বীয় পদার্থের উপর চাপ পড়িলে তাহার আয়তন কমিয়া যায়, তাহার দেহের কণাগুলি আরও ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া যায়—এক রাশি তূলাকে কলে চাপ দিয়া যে রকম বস্তাবন্দী করা হয়। এই কারণেই আকাশের বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরগুলি উপরের স্তরের বায়ুর তুলনায় ঘনতর হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক বয়েলের আবিষ্কৃত নিয়ম বা সূত্র—তাপের কোন কম-বেশী না করিয়া কোন স্থানে আবদ্ধ বায়ুর উপর চাপ যত বাড়ান যায় তাহার আয়তন সেই অনুপাতে কমিয়া যায়। চাপ যদি দ্বিগুণ কর তবে আয়তন অর্দ্ধেক হইবে, চাপ যদি অর্দ্ধেক কর ত আয়তন দ্বিগুণ হইবে।

জল ও বায়ুসংক্রান্ত দুইটি যন্ত্র—তোমরা সকলেই পাম্প বা শোষক যন্ত্র দেখিয়াছ। ইহার ভিতরে কি আছে, কিরূপে ইহা

কাজ করে, তাহা দেখাইবার জন্য চারিটি চিত্র দেওয়া হইল। পাম্প যন্ত্রটি মোটামুটি তোমাদের পরিচিত পিচকারী জাতীয়।

১। **পাম্প** (Pump)—ইহার প্রধান ভাগ দুইটি। একটি পিচকারীর মত **চোঙা** (cylinder) ও দ্বিতীয়টি তাহার মধ্যে উপর-নীচে চালাইবার একটি **ডাঁটি** (piston) ; জল ভিতরে আসিবার একটি পথ আছে পিচকারীর মুখের মত। জল বাহির হইবার আর একটি পথ

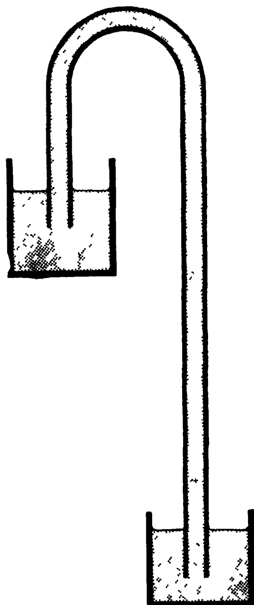


১৮। পাম্প

আছে উপর দিকে। ডাঁটির মাথায় ও চোঙার উপর একটি করিয়া **কপাট** বা **ঢাকন** (valve) আছে ; তাহা কেবল উপরের দিকে খোলে, নীচের দিকে খোলে না। ডাঁটি টানিলে বাহিরের বায়ুর চাপে নীচের ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া আসিবে। ডাঁটি ঠেলিলে তাহার মাথার ঢাকন খুলিয়া যাইবে, জল চোঙার উপরিভাগে চলিয়া যাইবে। আবার ডাঁটি টানিলে উপরের জলটা উপরের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, নীচের ছিদ্র দিয়া নূতন জল উঠিয়া আসিবে। তখন ডাঁটির মাথার ঢাকন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অনবরত ডাঁটি উপর নীচে চলিবে,

আর জল নীচের ছিদ্র, ডাঁটির মাথার ঢাকন ও উপরের ছিদ্র দিয়া আসিয়া অবশেষে বাহির হইতে থাকিবে।

২। **সাইফন** (Siphon)। ইহার মধ্যে **ডাটি** (piston) নাই, শুধু একটি নল। ইংরেজী U অক্ষরের আকারের অসমান বাহুবিশিষ্ট একটি বাঁকা কাচের নল সংগ্রহ কর। নলের যে মুখ দিয়া হয় খানিকটা জল ভিতরে ঢাল। দেখিবে যে নলের দুই বাহুতে বা শাখাতে জল সর্ব্বদা সমান থাকিবে, কখনও একদিকে উঁচু একদিকে নীচু হইবে না। নলের দুই মুখেই বায়ুর চাপ সমান, সুতরাং জল সমান থাকিতেই হইবে। এখন ছোট বাহুর মুখ বন্ধ করিয়া জল ঢালিতে ঢালিতে নলের দুই দিকের কাণা পর্য্যন্ত ভরিয়া ফেল। তার পর দুই মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া নলটিকে উল্টাও। উল্টাইয়া এক মুখ এক গেলাস জলের মধ্যে ডুবাইয়া আঙ্গুল সরাইয়া লও। পরে দ্বিতীয় মুখের আঙ্গুলও সরাও।



১৯। সাইফন

দেখিবে যে দ্বিতীয় মুখ দিয়া জল বাহির হইতে থাকিবে যতক্ষণ না তোমার গেলাস খালি হইয়া যায়। এইভাবে সহজেই উপর হইতে নীচে তরল পদার্থ স্থানান্তরিত করা যায়। ছোট শাখাটি সর্ব্বদা উপরের পাত্রে রাখিতে হয়। সাইফন দ্বারা কখনই নীচ হইতে উপরে অথবা একই উচ্চতায় জল পাত্রান্তর করা যায় না।

Questions

1. State the physical properties of air. How would you show that air exerts pressure (*a*) downwards, (*b*) upwards and (*c*) in all directions?
2. Describe the experiment of Torricelli regarding the pressure of air.
3. What is the utility of a barometer?
4. Explain the principles of the air-pump and the siphon.

দ্বিতীয় অধ্যায়

শক্তি (Energy)

গতিশক্তি ও স্থৈতিক শক্তি (Kinetic and potential energy)—শক্তি বলিলে কার্য্য করিবার ক্ষমতা বুঝায়। ক্রিয়াতেই শক্তির প্রকাশ। পদার্থ শক্তির বাহন। পৃথিবীতে আমরা কাজ করি, কেন না কাজ করিবার শক্তি আমাদের আছে। তুমি একটা ঢিল ছুড়িলে, সেই ঢিল গিয়া দেয়ালে লাগিল। তোমার শক্তি আছে বলিয়া ঢিল ছুড়িতে পারিলে। ঢিল তোমার নিকট হইতে শক্তি পাইয়া দেয়ালকে আঘাত করিল। ঢিলের এই শক্তি গতিমূলক। তোমার দেহের পেশী কুঞ্চিত করিয়া তুমি সেই **গতিশক্তি** (kinetic energy) ঢিলটিকে দিয়াছ। ঢিল দেয়ালে লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার যে শক্তি ছিল তাহা কি নষ্ট হইয়া গেল? নষ্ট হইয়া যায় নাই; কেন না, শক্তির ধ্বংস নাই। যেখানে দেয়ালে লাগিয়াছিল বা যেখানে মাটিতে পড়িল, সেখানে দুই বস্তুর পরস্পর সংঘাতে তাপ উৎপন্ন

হইয়াছিল। গতিমূলক শক্তি তাপে পরিণত হইয়াছে। ছাদের আলিসার উপর একখানা ইট আছে। ইটখানা যতক্ষণ আলিসার উপর আছে কোনও অনিষ্ট করিতেছে না। কিন্তু গড়াইয়া পড়িলেই বিপদ। নীচে ফুলগাছ থাকে ফুলগাছ ভাঙ্গিবে, মানুষ থাকে মানুষের মাথা ফাটিবে; অতএব দেখা যাইতেছে, যখন ছাদের উপর ছিল তখন উচ্চে অবস্থানের জন্য ইহার ভিতরে একটা শক্তি নিহিত ছিল। যখন ইটখানা ছাদের উপর তুলিয়াছিলে তখন তুমিই তাহাকে এই শক্তি দিয়াছিলে। ছাদস্থ ইটখানির যে শক্তি, তাহাকে **স্থৈতিক** (potential) শক্তি কহে। ভূমিতল হইতে যত উপরে কোন পদার্থ তুলিয়া রাখিবে তাহার স্থৈতিক শক্তি ততই বেশী হইবে। ইটখানা নীচে পড়িবার সময় তাহার যে শক্তির প্রকাশ হইবে তাহার নাম গতিশক্তি। ইট যত নীচে আসিবে ততই তাহার স্থৈতিক শক্তি কমিতে ও গতিশক্তি সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে। বস্তুতঃ মোট শক্তি বাড়েও না, কমেও না। ইহা নিত্য। কেবল এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে পরিচালিত হইতে বা রূপান্তরিত হইতে পারে মাত্র।

শক্তির প্রকারভেদ—পদার্থের নানা প্রকার শক্তি থাকিতে পারে। (১) **যান্ত্রিক শক্তি**—যথা, স্থৈতিক শক্তি, গতিশক্তি, ইত্যাদি; (২) **রাসায়নিক শক্তি**—ইহার ফলে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা, জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) এ এক টুকরা দস্তা ফেলিয়া দাও হাইড্রোজেন বাষ্প বুড় বুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিবে, দস্তাটুকু জিঙ্ক সালফেট (zinc sulphate) নামক পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে এবং উত্তাপের সৃষ্টি করিবে। (৩) **তাপ,** (৪) **আলোক,** (৫) **শব্দ,** (৬) **বৈদ্যুতিক** ও (৭) **চৌম্বক শক্তি।**

শক্তির রূপান্তর (Transformation of energy)

শক্তির ধ্বংস নাই, নূতন সৃষ্টি নাই। ইহা চিরন্তন, অনন্ত রূপবিশিষ্ট। এক প্রকার শক্তি যে অন্য প্রকার শক্তিতে পরিণত হইতে পারে তাহা নানা প্রকার পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায়।

শক্তির রূপান্তর পরীক্ষা (Experiments on transformation of energy)—(১) একটা গালার কাঠি লইয়া তাহাকে ফ্লানেল দিয়া ঘষ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। তাহার ফলে সেই গালা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাগজের কুচি আকৃষ্ট করিতে পারিবে। একটি চুম্বক লইয়া তাহার একদিক্ তোমার কলমকাটা ছুরির ফলার উপর ঘষিলে দেখিবে সেটিও চুম্বক হইয়া যাইবে এবং সূচ ইত্যাদি হালকা লোহার জিনিস অনায়াসে টানিবে।

(২) দেশলাইএব বাক্সের উপর দেশলাইকাঠি ঘষিলে জ্বলিয়া উঠে। এখানে দেশলাইএব কাঠির গতিশক্তি উত্তাপ উৎপন্ন করিয়াছিল ও তাহার মাথার মসলা রাসায়নিক শক্তির জন্য জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে পল্লীগ্রামে দেশলাই ছিল না। তখন লোকে লোহা ও চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিত। ইহাতে রাসায়নিক ক্রিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু ঠুকিবার শক্তি উত্তাপে পরিণত হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িত। ঘড়ি যে চলে তাহা দম দাও বলিয়া। দম দিবার সময় ঘড়ির মধ্যের স্প্রিংটিকে তুমি জড়াইতেছ, পরে, স্থিতিস্থাপকতা গুণে স্প্রিংটি খুলিতে থাকে বলিয়া ঘড়ি চলে। ছাদ হইতে ইট ভূমিতলে পড়িলে দুই পদার্থের সংঘাতে উত্তাপেরও সৃষ্টি হইবে আওয়াজও শুনা যাইবে। এখানে গতিমূলক বাহ্যশক্তি তাপ ও শব্দে পরিণত হইল।

(৩) গতিশক্তিকে যেমন তাপে পরিণত করা যায়, তেমনি তাপকেও আমরা নিয়ত গতিতে পরিণত করিতেছি। এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া রেল চালাইতেছি, পেট্রোল পোড়াইয়া মোটর গাড়ী ও উড়োজাহাজ চালাইতেছি।

(৪) তাপকে আলোতে পরিণত করা তোমরা নিত্য দেখিতেছ। এক খণ্ড লোহাকে আগুনের মধ্যে রাখিলে তপ্ত হইয়া উঠে। বেশী তপ্ত হইলে আলোক বিকীর্ণ করে। নানাস্থানে বিভিন্ন ইলেকট্রিক কোম্পানী যে **বিদ্যুৎপ্রবাহ** (electric current) ঘরে ঘরে সরবরাহ করিতেছে তাহা এঞ্জিন চালাইয়া উৎপন্ন করা হয়। অর্থাৎ, এঞ্জিনের গতিশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হয়। মোটর গাড়ীতে যে ব্যাটারি থাকে তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে ও প্রয়োজনমত জোগায়।

তাহা হইলে পৃথিবীতে নিয়ত কতভাবে শক্তির রূপান্তর ঘটিতেছে। তোমাদের চারিদিকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহা যদি লক্ষ্য কর তাহা হইলে দেখিবে যে শক্তি কিরূপে দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে সঞ্চালিত হইতেছে, কেমন করিয়া শক্তি রূপান্তরিত হইতেছে।

শক্তির মূল উৎস—বিশ্বের এই শক্তির মূল উৎস কোথায়? জ্যোতির্ব্বিদ্যা পড়িবার সময় শিখিবে যে আমাদের এই পৃথিবী একদিন সূর্য্যের শক্তি লইয়া সূর্য্য হইতেই বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি সেইদিন ঘুচিল? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে বুঝিবে যে সূর্য্যের আলোক ও তাপই পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা সন্তানবহুলা করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের আলোক ও তাপ আজ বন্ধ হইয়া যায় ত বসুন্ধরাতে প্রাণী ও উদ্ভিদ্ কতক্ষণ থাকিবে?

পদার্থ ও শক্তির তুলনা ঃ

পদার্থ	শক্তি
১। ওজন আছে।	১। ওজন নাই।
২। বিস্তৃতি আছে।	২। বিস্তৃতি নাই।
৩। অভেদ্যতা আছে।	৩। অভেদ্যতা নাই।
৪। পদার্থ তিন প্রকার ঃ (ক) কঠিন —আকার আছে (খ) তরল —আকার নাই (গ) বায়বীয় —আকার নাই	৪। শক্তি সাত প্রকার ঃ (ক) বাহ্য শক্তি (খ) রাসায়নিক শক্তি (গ) তাপ শক্তি (ঘ) আলোক শক্তি (ঙ) শব্দ শক্তি (চ) বৈদ্যুতিক শক্তি (ছ) চৌম্বক শক্তি
৫। রূপান্তর হয়।	৫। রূপান্তর হয়।
৬। ধ্বংস নাই।	৬। ধ্বংস নাই।

Questions.

1. What are the different forms of energy?
2. Why is it that a boat is rowed more easily with the current than against it?
3. Explain the different types of transformation of energy which take place when a ball is thrown downwards?
4. Where does a river get its energy from? What kind of energy is this? Explain the different kinds of transformation of energy in this case.
5. Compare matter and energy.

চতুর্থ অধ্যায়

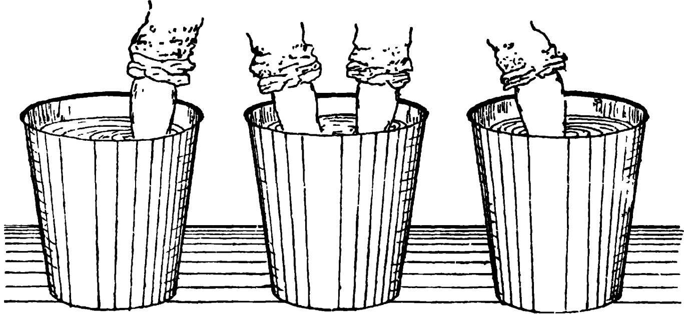
তাপ (Heat)

তাপের উৎস ও পদার্থের উপর তাপের প্রভাব

গরম ও ঠাণ্ডা—আমরা সাধারণতঃ গরম ও ঠাণ্ডা বলিয়া পদার্থের এক বিশেষ গুণ নির্দ্দেশ করি। গরম ও ঠাণ্ডা, এ দুটি কথাই আপেক্ষিক। বরফকে আমরা ঠাণ্ডা বলি, কিন্তু **জমাট অঙ্গারাম্ল বাষ্প** (dry ice), বরফ অপেক্ষা অনেক বেশী ঠাণ্ডা। কলিকাতার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রকে আমরা ভীষণ গরম বলি। কিন্তু সিন্ধু কি বিকানীরের মরুপ্রদেশ হইতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় আসিলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইবে।

পদার্থ মাত্রেরই উত্তাপ আছে, যত কমই হউক। আমাদের দেহের উষ্ণতা ৯৮·৪° ডিগ্রী। যে পদার্থের ইহা অপেক্ষা উষ্ণতা অধিক তাহা স্পর্শ করিলে গরম বোধ হইবে। যে পদার্থের ইহা অপেক্ষা উষ্ণতা কম তাহা ছুঁইলে ঠাণ্ডা মনে হইবে। কেন এরূপ মনে হয়, বুঝিতে পার? অঙ্গুলির দ্বারা গরম জিনিস ছুঁইলে তাহার উত্তাপ খানিকটা অঙ্গুলিতে আসে, সেজন্য গরম মনে হয়। ঠাণ্ডা জিনিস স্পর্শ করিলে অঙ্গুলির উত্তাপ খানিকটা বাহির হইয়া সেই জিনিসে যায়, সেজন্য ঠাণ্ডা মনে হয়। কোন বস্তু ঠাণ্ডা কি গরম তাহা আমরা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি। কাহারও জ্বর হইলে আমরা সাধারণতঃ গায়ে হাত দিয়া অনুভব করি গা ঠাণ্ডা অথবা গরম। কিন্তু আমাদের ত্বকের সাক্ষ্য

সকল সময় বিশ্বাসযোগ্য নহে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। পাশাপাশি তিনটি বালতি রাখিয়া প্রথম বালতিতে গরম ও তৃতীয় বালতিতে ঠাণ্ডা জল রাখ। দ্বিতীয় বালতিতে ঈষদুষ্ণ জল রাখ। এখন প্রথম বালতিতে বাম হস্ত ও তৃতীয় বালতিতে দক্ষিণ হস্ত কিছুক্ষণ



গরম জল ঈষদুষ্ণ জল ঠাণ্ডা জল

২০। উষ্ণতা পরীক্ষা

ডুবাইয়া রাখিয়া দুই হাতই পরে দ্বিতীয় বালতিতে ডুবাইলে দেখিবে বালতির জল বাম হস্তে ঠাণ্ডা আর দক্ষিণ হস্তে গরম বোধ হইতেছে।

তাপের উৎস—তাপের প্রধান ও মূল উৎস সূর্য্য। সূর্য্য হইতেই আমরা মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ সমস্ত তাপ সংগ্রহ করি। তাপের দ্বিতীয় উৎস ভূগর্ভ। তাপের তৃতীয় উৎস দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া। শীতের দেশে মানুষ রৌদ্রে বসিয়াও শরীর গরম করে, আবার কয়লা, কাঠ জ্বালিয়াও আগুন পোহায়। তাপের চতুর্থ উৎস বিদ্যুৎ। তাপের পঞ্চম উৎস ঘর্ষণাদি বাহ্যিক ক্রিয়া।

তাপ প্রয়োগের ফল—কোন জিনিসকে তাতাইলে তাহার কি কি পরিণাম হইতে পারে তাহা বর্ণনা করিবার নয়, প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়।

প্রথম পরিণাম—তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থ গরম হয়। তাপ বাহির করিয়া লইলে পদার্থ ঠাণ্ডা হয়।

দ্বিতীয় পরিণাম—অবস্থা পরিবর্ত্তন। সীসক, মোম, দস্তা, বরফ, ইহার যেটিকেই গরম কর গলিয়া যাইবে। অর্থাৎ কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তেমনই জল, স্পিরিট, পারদ ইত্যাদি তরল পদার্থ গরম করিলে ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইবে।

তৃতীয় পরিণাম—বাহ্য গুণের পরিবর্ত্তন। একখণ্ড দণ্ড-চুম্বক লইয়া খুব গরম কর, ঠাণ্ডা হইলে দেখিবে উহার চৌম্বক শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

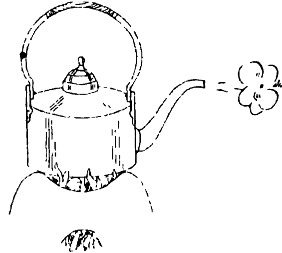
চতুর্থ পরিণাম—আয়তনের পরিবর্ত্তন। গরম করিলে পদার্থের আয়তন বাড়ে, ঠাণ্ডা করিলে কমে।

পঞ্চম পরিণাম—রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। তাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন পদার্থ সব সময়ে যে গলিয়া যায় তাহা নহে। কাষ্ঠখণ্ডের উপর তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা গলিবে না। ক্রমশঃ পুড়িতে থাকিবে অর্থাৎ বায়ুব অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করিবে।

তাপ ও ওজন—পদার্থকে যতই তাতাও না কেন, তাহার ওজনের কোন তফাৎ হইবে না। ওজন ঠিক রহিল, আয়তন বাড়িল, ইহার অর্থ ত এই যে পদার্থকণা আগে যত ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল গরম করার পর আর তাহা নাই। কণাগুলি আরও ফাঁক ফাঁক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ঘনত্ব কমিয়া গিয়াছে।

জলের উপর তাপের প্রভাব (Effect of heat on water)

জ্বলন্ত উনানের উপর কেটলিতে জল বসাইলে, জল ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয় ও নল দিয়া বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। কেটলির জলও কমিতে থাকে। কেটলির নলের একটু দূরে যে ধোঁয়ার মত পদার্থ দেখা যায়, তাহাকে সচরাচর লোকে ভুল করিয়া ষ্টীম কহে। কিন্তু সত্য ষ্টীম নলের ঠিক মুখে অদৃশ্য পদার্থ। নলের মুখের একটু দূরে যে ধোঁয়ার মত পদার্থ দেখা যায় তাহা নলের মুখ হইতে নির্গত অদৃশ্য ষ্টীম ঠাণ্ডায় জমিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হইয়া ধোঁয়ার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কেটলিতে জল ফুটাইলে কেটলির ঢাকনি উঠানামা করিয়া শব্দ করে। অর্থাৎ তাপ পাইয়া জলীয় বাষ্পের আয়তন বাড়ে ও ঢাকনি উপরে ওঠে, আবার কিছু বাষ্প বাহির হইয়া গিয়া আয়তন কমিয়া যায়, ঢাকনিও নামে। কেটলির জল তাপের ফলে বাষ্পে পরিণত হইলে যে উহার আয়তন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইতেই বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌ (James Watt) বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কার করেন।



২১। ফুটন্ত জলের বাষ্প কেটলির নলের মুখে অদৃশ্য

কেবল ফুটন্ত জল হইতেই বাষ্পের সৃষ্টি হয় না। সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতির উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদা কিছু না কিছু জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে। আমরা যে ভিজা কাপড় শুকাই তাহার অর্থ ভিজা কাপড়ের জলকে বাষ্পে পরিণত করা। ঘরের মেঝে জল

দিয়া ধুইলে খানিক পরে একেবারে শুকাইয়া যায় অর্থাৎ মেঝের জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। অতএব জল সর্ব্বসময়ে বাষ্প হইয়া যাইতেছে।

যখন বরফ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে তখন তাহার যে উষ্ণতা (temperature), যতই তাপ প্রয়োগ কর, সমস্ত বরফ গলিয়া জল হওয়া পর্য্যন্ত সে উষ্ণতা বিন্দুমাত্র কম বেশী হইবে না। বায়ুর সাধারণ চাপে, ফুটন্ত জলের নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রা হইল ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে উহাকে যতই তাপ দেওয়া হউক, যতক্ষণ এক ফোঁটা জল অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ তাহার তাপমাত্রা ঐ ১০০° ডিগ্রীই থাকিবে।

ফুটন্ত জলের সকল অংশ হইতেই বাষ্প উঠে; কিন্তু যখন জল ফুটান হয় না, যেমন নদী পুকুর বা গ্লাসের জল, তখন তাহার উপরিভাগ হইতেই বাষ্প জন্মে। এই উপরিভাগ যত বিস্তৃত হয় বাষ্পীভবনও তত দ্রুত হইতে থাকে।

বেলে মাটির কুঁজায় বা কলসীতে জল ঠাণ্ডা হয় কেন? বেলে মাটির ভিতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া জল সর্ব্বদা বাহিরে আসিয়া বায়ুর সংস্পর্শে বাষ্পীভূত হয়। এই অবিরাম বাষ্পীভবন হেতু পাত্রস্থিত জল কেবলই তাপ প্রদান করিতে থাকে, সেজন্য তাপ হারাইয়া জল ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। এই একই কারণে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাওয়া লাগাইলে ঠাণ্ডা বোধ হয়।

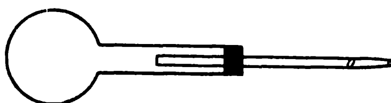
Questions.

1. What are the different sources of heat?
2. What are the different effects of heat?
3. What is steam? What is the foggy substance that we see when water is boiled in a kettle?
4. Why does the water in a porous earthen pot get cool?

বায়ুর উপর তাপের প্রভাব ঃ বায়ু চলাচল
(Effect of heat on air : Ventilation)

বায়ুর উপর তাপের প্রভাব—তাপে বায়বীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় ও উহার আপেক্ষিক ঘনত্ব কমিয়া যায়।

একটি কাচের ফ্লাস্কের মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ আছে ও সেই ছিপিতে ছেদ করিয়া একটি কাচের সরু নল ফ্লাস্কের ভিতর চলিয়া

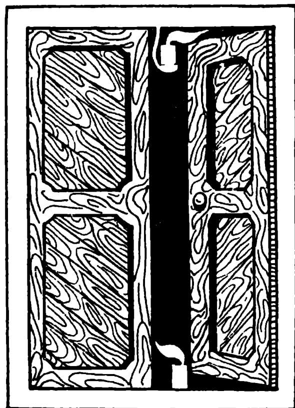


২২। তাপে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় কালির ফোঁটা অগ্রসর হইতেছে

গিয়াছে। এখন এই সরু নলের ভিতর এক ফোঁটা লাল কালি প্রবেশ করাইয়া, ফ্লাস্কটি নাড়িয়া কালি আরও ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দাও। এইবার ফ্লাস্কে তাপ দাও। দেখিবে তাপের ফলে ফ্লাস্কের ভিতরের বায়ু বৃদ্ধি পাইয়া লাল কালির ফোঁটাটিকে অনেকটা নলের বাহিরের মুখের নিকট ঠেলিয়া আনিয়াছে। তাপ বন্ধ কর ঠাণ্ডা পাইয়া ভিতরের বায়ুর আয়তন কমে, কালির ফোঁটা বাহিরের বায়ুর চাপে নলের আরও ভিতরে চলিয়া যায়।

তাপে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উহা হালকা হইয়া উপরে উঠে। এক পুরাতন প্রবাদ আছে, "আগুন জ্বলে যেখানে, ঝড় বয়ে যায় সেখানে।" জ্বলন্ত আগুনের সংলগ্ন বায়ু তাপের প্রভাবে আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছে ও ক্রমাগত হালকা হওয়ার দরুণ উপরে চলিয়া যাইতেছে, আর চতুষ্পার্শের অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন বায়ু তাহার স্থান লইতেছে।

বায়ু চলাচল—কোন বদ্ধ ঘরের একটি দরজা খোলা রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া বায়ুপ্রবাহ কিরূপ চলিতেছে তাহা একটি সহজ পরীক্ষায় দেখিতে পারিবে। খোলা দ্বারপথে উপর নীচে দুইটি মোমবাতি জ্বালাইয়া দাও। দেখিবে, উপরের শিখাটি বাঁকিয়াছে বাহিরের দিকে, নীচের শিখাটি হেলিয়াছে ভিতরের দিকে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে মেঝের কাছ দিয়া বায়ু প্রকোষ্ঠমধ্যে ঢুকিতেছে, আর উপর দিয়া উষ্ণ হালকা বাতাস প্রকোষ্ঠমধ্য হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে দ্বার দিয়া বায়ু চলাচল হয়। এই জন্যই বদ্ধ ঘরের দূষিত বায়ু যাহাতে বাহির হইয়া যায় সেজন্য কড়ির নিকট ছিদ্রপথ (ventilator) রাখা হয়। মেঝের নিকট কখনও ভেণ্টিলেটর থাকে না। ভেণ্টিলেটরকে কাজে লাগাইতে হইলে অন্ততঃ একটি জানালা বা দরজা খোলা রাখা উচিত।

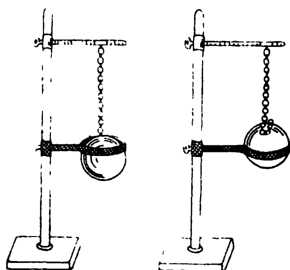


১৩। উপরের শিখাটি বাহিরের দিকে ও নীচেরটি ভিতরের দিকে মুখ করিয়াছে

কঠিন পদার্থের উপর তাপের প্রভাব
(Effect of heat on solid bodies)

তাপ প্রয়োগে আয়তন বাড়ে ও ঠাণ্ডা করিলে কমে, ইহা কঠিন পদার্থে খালি চোখে দেখান শক্ত। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণ করা যায়।

(১) একটি আংটি ও একটি পিতলের গোলক লও। তাহাদের মাপ এইরূপ হইবে যে গোলকটি আংটির মধ্য দিয়া ঠিক গলিয়া যাইতে পারে। এখন গোলকটিকে গরম কর দেখিবে উহা আংটির ভিতর ঢুকিবে না। কিন্তু একটু পরে ঠাণ্ডা হইলে সহজেই আবার গলিয়া যাইবে।



২৪। তাপ প্রয়োগের ফল

(২) গরুর গাড়ীর চাকার উপর লোহার হাল (টায়ার) পরান থাকে। কি করিয়া টায়ার পরান হয় জান? উহাকে খুব গরম করিয়া চাকার উপর লাগাইয়া জল ঢালা হয়। ঠাণ্ডা হইলেই উহা চাকাকে একেবারে কামড়াইয়া ধরে।

(৩) তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে, যে লোহার লাইনের উপর দিয়া রেল চলে তাহা এক অবিভক্ত লৌহখণ্ড নহে, তাহার মাঝে মাঝে জোড় আছে। এই জোড়গুলিতে বেশ একটু ফাঁক রাখা হয়। ফাঁক না রাখিলে রৌদ্রের তাপে, কি রেলের চাকার ঘর্ষণে লাইন গরম হইয়া লম্বা হইবার সময় যেখানে সেখানে বাঁকিয়া যাইত। আঁকাবাঁকা লাইনের উপর দিয়া রেল গাড়ী চলিতে পারিত না।

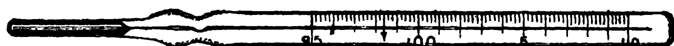
Questions.

1. What are the effects of heat on air?
2. Explain how the ventilation of a room is effected.
3. Illustrate by examples the effects of heat on solid bodies.
4. Explain why there is always a strong wind when a house is on fire.

থার্ম্মোমিটার (Thermometer)

তাপ ও উষ্ণতা (Heat and Temperature)—এই দুই শব্দের সম্বন্ধ যে অতি নিকট তাহা সহজেই অনুমেয়। তাপ এক প্রকার শক্তি, তাহার প্রয়োগে পদার্থ গরম হয়। যে জিনিস যত গরম তাহা হইতে অন্য জিনিসে তাপসঞ্চরণের সম্ভাবনা তত বেশী। কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ কত অধিক গরম, তাহার আপেক্ষিক পরিমাণকে শেষোক্ত পদার্থের উষ্ণতা কহে। এক উত্তপ্ত লৌহখণ্ড হইতে এক বালতি ঈষদুষ্ণ জলে সহজেই তাপের সঞ্চরণ হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক বালতি জলের তাপের পরিমাণ উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের তাপের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

উষ্ণতা নির্ণয় করে বলিয়াই **থার্ম্মোমিটারকে** (thermometer) তাপমান যন্ত্র কহে। তাপপ্রয়োগ করিলে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি হয়, এই তথ্যটি থার্ম্মোমিটার নির্ম্মাণের মূলে নিহিত আছে।



২৫। থার্ম্মোমিটার

থার্ম্মোমিটার প্রস্তুতকরণ—একটি আগাগোড়া সমান সূক্ষ্মছিদ্র বিশিষ্ট কাচের কৈশিক নল (capillary tube) লইয়া প্রথমে তাহার এক প্রান্ত গলাইয়া একটি বদ্ধ গোলক বা বাল্‌ব্ (bulb) প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। পরে তাহার খোলা মুখটি পরিষ্কৃত ও শুষ্ক করিয়া খানিকটা বিশুদ্ধ পারদের মধ্যে ডুবান হয়। এখন গোলকটি

একটু গরম করিলে নলমধ্যস্থ বায়ু আয়তনে বাড়ে, ও তার খানিকটা নলমুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। পরে গোলকটিকে ঠাণ্ডা করিলে ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হয়, ও তাহার ফলে কিছু পারা নলের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন নলটিকে তুলিয়া উল্টাইলে সেই পারাটুকু গোলকের মধ্যে চলিয়া যায়। এই ভাবে কয়েকবার চেষ্টা করিলে প্রয়োজনমত পারা নলের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবে। যন্ত্রের ভিতর এতটা পারার আবশ্যক যে গোলকটি সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া নলের মধ্যে কিছুদূর অবধি উঠে। ইহার পর গোলকের মধ্যের পারাকে গরম করিয়া ফুটাইতে হইবে। তাহা হইলে নলের রন্ধ্রে যত বাতাস আছে, সব বাহির হইয়া যাইবে ও রন্ধ্রপথ পারদবাষ্পে ভরিয়া যাইবে। এই অবস্থাতেই নলের খোলা মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে পর তাহার উপর দাগ কাটিতে হইবে, যেমন হাইড্রোমিটারের উপর দাগ কাটা থাকে। নলটিকে প্রথম গলন্ত বরফে ডুবাইয়া পারদ যেখানে নামিল, সেখানে কাচের গায়ে একটি দাগ কাট। পরে ফুটন্ত জলের উপরিস্থ বাষ্পে কিয়ৎকাল রাখিয়া দ্বিতীয় দাগ কাট। প্রথম দাগটিকে শূন্য ও দ্বিতীয়টিকে এক শত ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানকে একশত ভাগ কর। এইভাবে থার্ম্মোমিটার প্রস্তুত হইল।

উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি—উষ্ণতা পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি আছে। উপরে একশত ভাগ করিয়া দাগ কাটিবার পদ্ধতি যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহার নাম **সেণ্টিগ্রেড**। আর এক পদ্ধতি আছে যাহাতে গলন্ত বরফের উষ্ণতা শূন্য ও ফুটন্ত জলের উপরিস্থ বাষ্পের উষ্ণতা আশী ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আশী ভাগ করা হয়। ইহার নাম **রেমার** পদ্ধতি। তৃতীয় পদ্ধতি ইংলণ্ডে ও

ইংরেজের রাজ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। গলন্ত বরফের উষ্ণতা বত্রিশ ও ফুটন্ত জলের উপরিস্থ বাষ্পের উষ্ণতা দুইশত বারো ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানকে একশত আশী ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়। এই পদ্ধতির নাম **ফারেনহাইট**। আমাদের দেহের উষ্ণতা ৯৮·৪ ডিগ্রী যে আগে বলিয়াছি, তাহা এই পদ্ধতি অনুযায়ী মাপ।

সেন্টিগ্রেড এক ডিগ্রী তাহা হইলে $= \frac{১৮০}{১০০} = \frac{৯}{৫}$ ডিগ্রী ফাঃ-র সমান।

সেঃ এক ডিগ্রী $= \frac{৮০}{১০০} = \frac{৪}{৫}$ ডিগ্রী রেঃ-র সমান।

কোন পদার্থের উষ্ণতা ৩০° সেঃ হইল, ফাঃ কত হইবে, রেঃ কত হইবে?

৩০° সেঃ $= (৩০ \times \frac{৯}{৫}) + ৩২^\circ$ ডিগ্রী ফাঃ $= ৮৬^\circ$ ফাঃ।

৩০° সেঃ $= ৩০ \times \frac{৪}{৫}$ রেঃ $= ২৪^\circ$ রেঃ।

পদ্ধতি	গলন্ত বরফের উষ্ণতা বা জলের হিমাঙ্ক	ফুটন্ত জলের উপরিস্থ বাষ্পের উষ্ণতা বা জলের স্ফুটনাঙ্ক	মধ্যবর্ত্তী স্থান কত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে
সেন্টিগ্রেড	০	১০০	১০০
রেমার	০	৮০	৮০
ফারেনহাইট	৩২	২১২	১৮০

Questions

1. Explain the difference between heat and temperature.
2. Describe the preparation of a thermometer. What are the different ways of graduating a thermometer?

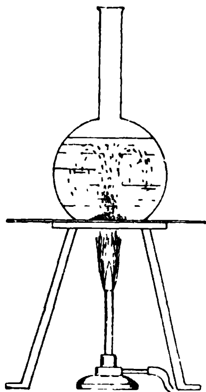
তাপসঞ্চালন (Transference of heat)

তাপের পরিবহন (Conduction of heat)—একটি লম্বা লৌহদণ্ডের একদিক ধরিয়া অন্যদিক আগুনে ঢুকাইয়া দাও। আগুনের তাপ ধীরে ধীরে আগা হইতে তোমার হাত পর্য্যন্ত চলিয়া আসিবে। বাহির করিয়া দণ্ডটি রাখিয়া দাও, সমস্তটা এক সমান গরম হইয়া যাইবে। এই ভাবে তাপসঞ্চালনকে বলা হয় পরিবহন। প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে, পরিবহনের সময় লৌহদণ্ডের কোন ভাগই স্থানচ্যুত হয় না।

সকল পদার্থের পরিবহন-ক্ষমতা সমান নয়। তাম্র ও রৌপ্যের বেশী, লৌহ ও সীসকের কম। কাঠ, কাচ ইত্যাদির আরও অনেক কম। সাধারণতঃ ধাতব পদার্থের এই ক্ষমতা বেশী। একটা লোহার চেয়ার ও একটা কাঠের চেয়ার রৌদ্রে রাখিয়া দিলে কাঠের চেয়ার অনেক ঠাণ্ডা মনে হইবে। চীনামাটির পেয়ালায় গরম চা বেশ খাওয়া যায়, কিন্তু ধাতুনির্ম্মিত পেয়ালায় চুমুক দিলে ঠোঁট পুড়িয়া যায়। কাচের এক দিক গরম করিলে ফাটিয়া যায় কেন, লোহা যায় না কেন, বলিতে পার? কাচের পরিবাহিতা কম বলিয়া উহার এক স্থানে গরম লাগিলে সে স্থান আয়তনে বাড়ে। অন্য স্থানে সেই তাপ শীঘ্র পরিবাহিত হয় না, তাহাতেই ফাটিয়া যায়।

তাপের পরিচলন (Convection of heat)—তাপপরিবহনের সময় কঠিন পদার্থের অংশ স্থানচ্যুত হয় না। তরল পদার্থের অবস্থা অন্যরূপ। তাপ লাগিবা-মাত্র তপ্ত অংশ উপরে ভাসিয়া উঠে, অন্য অংশ তাহার স্থান লয়। আবার সে অংশ তপ্ত হইয়া উপরে উঠে, আর এক অপেক্ষাকৃত শীতল অংশ

সেখানে আসে। এইভাবে তরল পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে পরিচলন। বাষ্পীয় পদার্থে তাপসঞ্চালন এইরূপেই হয়।



২৬। তাপ পরিচলন পরীক্ষা

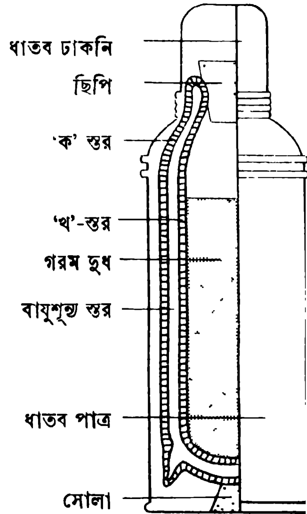
তাপ পরিচলন সম্বন্ধে পরীক্ষা।—একটি কাচপাত্রে খানিকটা জল লও। সেই জলে খুব সরু সরু কাগজকুচি বা কুটো ফেলিয়া দাও। তারপর পাত্রটিকে স্পিরিট চুল্লীর বা বুন্‌সেন দীপের উপর চড়াইয়া দাও। জলের মধ্যে কাগজ কুচির গতিবিধি লক্ষ্য করিলে ঠিক বুঝিতে পারিবে তাপপরিচলন কাহাকে বলে।

তাপের বিকিরণ (Radiation of heat)—তাপপরিবহন ও পরিচলন পদার্থকণার মধ্য দিয়াই ঘটে, শূন্যস্থানের মধ্য দিয়া ঘটে না। বিকিরণ শূন্য স্থানের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘটিতে পারে ও নিয়ত ঘটিতেছে। সূর্য্যকিরণ (আলোক কিরণ ও তাপ কিরণ, দুইই) পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থিত মহাশূন্যের ভিতর দিয়া অনায়াসে আসিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, যে সকল পদার্থে ও যে স্থানে বায়ু পর্য্যন্ত নাই, সেই মহাশূন্য মধ্যেও এমন একটা কিছু আছে যাহার সাহায্যে বিকিরণ ঘটে। তাঁহারা ইহার নাম দিলেন **ঈথর** (Ether)। এই ঈথর দেখা, স্পর্শ করা বা তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা কিছুই সম্ভব নয়। ঈথরের ঢেউ উঠিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া এই বিকীর্ণ তাপ আসিতেছে। কিন্তু বিকিরণের ফলে পথবর্ত্তী বায়ুকণাগুলি তপ্ত হইয়া উঠিতেছে না। বিকিরণের ইহাই বিশেষত্ব।

সূর্য্যের তাপবিকিরণের ফলে দিনের বেলা গরম ও রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ হয়।

কালো বা অন্য রঙ্গীন পদার্থ প্রচুর পরিমাণে তাপ বিকিরণ করে। সেজন্য গরম দেশে সাদা পোষাক পরা ভাল। চায়ের কাপের রং সাদা হইলে তাহাতে শীঘ্র চা জুড়াইয়া যায় না। কঠিন পদার্থ শীঘ্র গরম বা ঠাণ্ডা হয়।

থার্মস্-ফ্লাস্ক (Thermos flask)—তিনটি প্রক্রিয়ায় তাপ চলাচল হইতে পারে—(১) পরিচলন (২) পরিবহন ও (৩) বিকিরণ। থার্মস্-ফ্লাস্কে এই তিন প্রক্রিয়াই যাহাতে কার্য্যকরী না হয় তাহার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তাপ পরিচলন যাহাতে না হয় তাহার জন্য কাচের পাত্রটির দুইটি স্তর আছে (ক,খ), ও মাঝখানের বাতাস বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। বাতাস না থাকায় পরিচলন বন্ধ। পাত্রটি কাচের, ও উহা কর্কের উপর রাখা হইয়াছে। কাচ ও কর্ক তাপপরিবহনে বাধা দেয়। পাত্রটি সাদা চকচকে বলিয়া তাপবিকিরণেও বাধা দেয়। এখন এইরূপ পাত্রে গরম দুধ রাখিয়া ছিপি বন্ধ করিলে বহুক্ষণ গরম থাকিবে। বাহিরের ধাতুনির্ম্মিত পাত্রটি কাচপাত্রের আধারের কাজ করে।



২৭। থারমস্-ফ্লাস্ক

Questions

1. State and illustrate the various modes of propagation of heat.
2. What do you understand by conduction, convection and radiation of heat?
3. Why does hot milk remain hot in a thermos flask for a long time?

চতুর্থ অধ্যায়

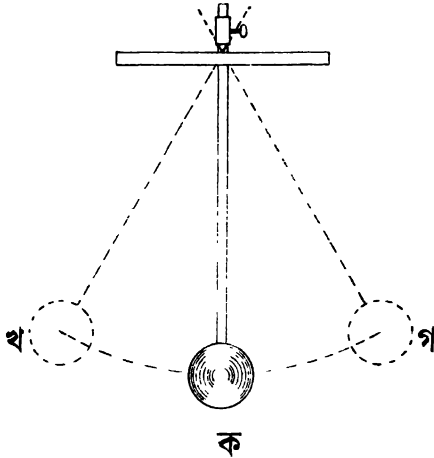
দোলক (Pendulum)

দোলক—একটি অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তুকে সূতা বা তার দিয়া ঝুলাইলে দোলক প্রস্তুত হইল। ভারী বস্তুটিকে দোলকপিণ্ড বলে। তোমরা সকলেই দেয়ালঘড়িতে দোলক বা পেণ্ডুলাম দেখিয়াছ। দোলকের আবিষ্কর্ত্তা মহাপণ্ডিত **গ্যালিলিও।** কিন্তু ঘড়িতে দোলকের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয় তাঁহার আবিষ্কারের অনেক পরে। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে **হায়গেনস্** প্রথম ঘড়িতে দোলক ব্যবহার করেন।

দোলক আবিষ্কারের গল্প—১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা। গ্যালিলিও তখন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র। একদিন সন্ধ্যাবেলায় পিসা-গির্জ্জার বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, গির্জ্জার ছাদ হইতে ঝুলান একটি প্রদীপ তালে তালে দুলিতেছে, অর্থাৎ যে স্থান হইতে দোলন আরম্ভ হইতেছে একবার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে প্রদীপটির প্রত্যেকবার ঠিক সমান-সময় লাগিতেছে। একটি অচেতন পদার্থ অনায়াসে এইরূপ তালে তালে দোল খাইতেছে দেখিয়া গ্যালিলিও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।* তখনকার

দিনে ত ঘড়ি ছিল না! গ্যালিলিও নিজের নাড়ীর গতির সহিত প্রদীপের দোলন মিলাইতে লাগিলেন। দেখিলেন যে প্রদীপের প্রত্যেক দোলনে তাঁহার নাড়ীও ঠিক সমান উঠানামা করিতেছে। গ্যালিলিও ত সাধারণ ছাত্র ছিলেন না। তিনি বাড়ী ফিরিয়া নানা প্রকার জল্পনা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিলেন। ফলে দোলকের তথ্য আবিষ্কৃত হইল।

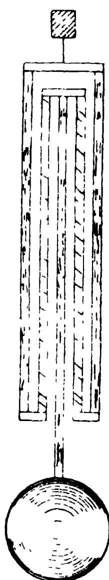
দোলক সম্বন্ধে পরীক্ষা—চিত্র হইতে দেখিতেছ যে দোলক-পিণ্ড 'খ' হইতে 'গ', আবার 'গ' হইতে 'খ' এইরূপে দুলিতেছে।



২৮। দোলক

দুলিতে আরম্ভ হওয়ার আগে দোলকের পিণ্ড 'ক'তে ছিল। 'ক খ' বা 'ক গ' এই অন্তরকে **দোলকের বিস্তার** বা amplitude কহে। 'খ' হইতে 'গ'তে যাইয়া আবার 'গ' হইতে 'খ'তে ফিরিয়া আসিতে মোট যে সময় লাগে তাহাকে **দোলকের কাল** বা period বলা হয়।

গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত তথ্য—(১) বিস্তার সামান্য হইলে দোলকটি সমান সময়ে প্রত্যেক দোলন শেষ করিবে; (২) দোলকের সূত্রের দৈর্ঘ্যের সহিত দোলকের কালের একটি সম্বন্ধ আছে। দৈর্ঘ্য চারগুণ বাড়াইলে কাল দুইগুণ বাড়িবে। দৈর্ঘ্য নয় গুণ বাড়াইলে কাল বাড়িবে তিন গুণ। দৈর্ঘ্য ষোল গুণ বাড়াইলে কাল বাড়ে চার গুণ, ইহাই বাড়িবার নিয়ম। ঘড়ির দোলকপিণ্ড উপর নীচ করিয়া ঘড়িকে ফাষ্ট স্লো করা হয়। (৩) মহাকর্ষ শক্তির সহিতও দোলকের কালের সম্বন্ধ অতি নিকট। মহাকর্ষ চতুর্গুণ হইলে কাল হইবে অর্দ্ধেক, মহাকর্ষ ষোল গুণ হইলে কাল হইবে সিকি, এইরূপ। (৪) দোলক সম্বন্ধে আরও একটি মূল্যবান্ তথ্য এই যে পিণ্ডের আয়তন বা ওজনের সহিত দোলকের কালের কোন সম্বন্ধ নাই। পিণ্ড কাঠের, লোহার, বা মোমের—যে পদার্থেরই নির্ম্মিত হউক, যত বড় বা যত ভারীই হউক, দোলকের কাল একই থাকিবে।



২৯। প্রতিবিহিত দোলক (ঘড়ির)

প্রতিবিহিত দোলক (Compensated pendulum)—দোলকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হইলে দোলনকাল বাড়ে। এজন্য সাধারণ দোলকবিশিষ্ট ঘড়ি শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে "স্লো" হইয়া যায়। এইজন্য প্রতিবিহিত দোলক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি বিভিন্ন ধাতুতে গঠিত যথাক্রমে তিনটি ও দুইটি ধাতুখণ্ড এইরূপে সন্নিবিষ্ট আছে যে উহাদের তিনটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে

দোলকটির দৈর্ঘ্য যতটুকু বাড়ে অপর দুইটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে দোলকটির দৈর্ঘ্য ঠিক ততটুকু কমিয়া যায়। এজন্য মোট দৈর্ঘ্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া এই দোলকগুলির দোলনকাল সব ঋতুতেই সমান থাকে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার চিত্র দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে।

Questions

1. How would you show that a solid substance increases in volume when heated. Give examples from everyday life.
2. What is a pendulum? Explain the terms amplitude and period of a pendulum.
3. Describe a compensated pendulum.

পঞ্চম অধ্যায়

আলোক (Light)

আলোকের স্বরূপ

আলোকের স্বরূপ কি তাহা সকলে না জানিলেও আলোকের অনুভূতি অন্ধ ব্যতীত সকলেরই আছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, আলো জ্বালিলে দেখা যায়। সুতরাং আলো জ্বালিলে ঐ স্থানে এমন একটি পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় যে অদৃশ্য দ্রব্যসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়।

আলোকের তরঙ্গ—আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে আলো জ্বলিলে তাহার চতুষ্পার্শে একপ্রকার তরঙ্গ উঠে। সেই তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর্দ্বয়ে প্রবেশ করিয়া চক্ষুর পশ্চাতে যে পর্দ্দা আছে তাহাতে প্রতিভাত হইলেই আমরা দেখিতে পাই। তরঙ্গ বলিলেই ইহাও বলিতে হইবে যে তরঙ্গের বাহন কি।

আমরা নদীতে যে ঢেউ দেখি তাহার বাহন জল, শব্দতরঙ্গের বাহন জড়কণামাত্রই। আমরা আলোক পাইয়া থাকি সূর্য্য হইতে। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে মহাশূন্য। এই মহাশূন্য **ঈথর** (ether) নামক এক পদার্থে পরিপূর্ণ। এই ঈথর সর্ব্বব্যাপী—জলে, স্থলে, আকাশে, প্রস্তরে, মৃত্তিকায় সর্ব্বত্র আছে। জড়পরমাণুর ফাঁকে ফাঁকে ঈথর অনুপ্রবিষ্ট। এই সর্ব্বব্যাপী ঈথর আলোকতরঙ্গের পরিবাহক, বিকীর্ণ তাপের পরিবাহক ও পরে দেখা যাইবে যে, বিদ্যুৎ তরঙ্গেরও পরিবাহক।

আলোক তরঙ্গ অদৃশ্য, আমরা দেখিতে পাই শুধু সেই তরঙ্গের দ্বারা উদ্ভাসিত পদার্থ। একটি অন্ধকার ঘরে জানালার ছিদ্র দিয়া রৌদ্রের একটি রশ্মি প্রবেশ করিয়া দেয়ালে বা মেঝেতে পড়িয়াছে। যে স্থানে পড়িয়াছে সেই স্থান আলোকিত ও দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু ছিদ্র হইতে সেই আলোকিত স্থান পর্য্যন্ত বাতাসে যে রশ্মির পথ, ধূলিকণামাত্র শূন্য হইলে তাহা অদৃশ্য থাকিবে। আলোকের দ্বারা সমুজ্জ্বল পদার্থ ই আমাদের চক্ষুগোচর হয়; মধ্যবর্ত্তী তরঙ্গ নহে।

আলোক সম্পর্কে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ—

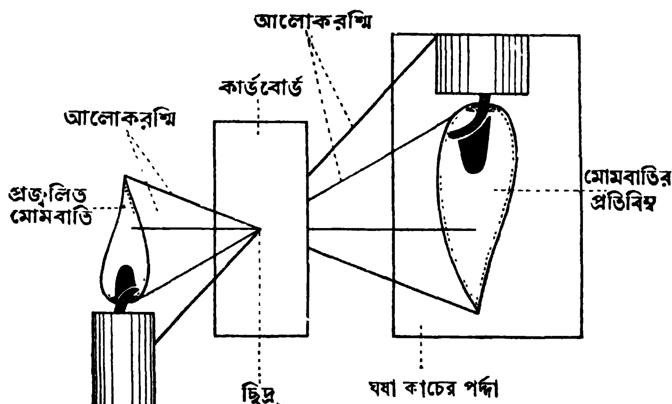
আলোক সম্পর্কে পদার্থসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) **স্বচ্ছ** (transparent)—যথা কাচ, জল, বায়ু, অভ্র, স্ফটিক ইত্যাদি। (২) **ঈষদচ্ছ** (translucent)—ঘষা কাচ, তৈলাক্ত কাগজ, কুয়াসা ইত্যাদি। (৩) **অস্বচ্ছ** (opaque)—কাঠ, লোহা, পাথর ইত্যাদি।

একেবারে অস্বচ্ছ পদার্থ কিন্তু পৃথিবীতে নাই। যে কোনও পদার্থকে খুব পাতলা করিয়া কাটিলে তাহার মধ্য দিয়া অল্পবিস্তর আলোক যাইবেই। আলোক বলিলে যাহা বুঝায় তাহার মধ্যে এমন কিরণও আছে যাহা কাষ্ঠ, চর্ম্ম ইত্যাদি ভেদ করিয়া যাইতে

পারে। X-ray কিরণের সাহায্যে চিকিৎসকেরা প্রতিদিন দেহমধ্যস্থ অস্থির ও যন্ত্রাদির ফটোগ্রাফ লইয়া অসুস্থ দেহের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আলোকের সরল রেখায় গমন
(Rectilinear propagation of light)

আলোককিরণ সর্ব্বদা সরল রেখায় চালিত হয়, কখনও আঁকাবাঁকা পথে চলে না। কোন কারণে আলোকরশ্মি যদি পথ পরিবর্ত্তন করে, নূতন পথেও সে সরল রেখাতেই চলিবে।

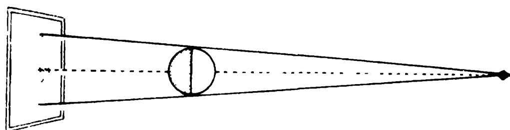


৩০। আলোককিরণ সর্ব্বদা সরল রেখায় চালিত হয়

আলোকের সরল গতি প্রমাণের পরীক্ষা— একটি জ্বলন্ত মোমবাতির সম্মুখে পরে পরে দুইটি কার্ডবোর্ডকে খাড়া করিয়া বসাও। বাতির শিখাটি এখন সম্পূর্ণরূপে বোর্ড দুইটির আড়ালে রহিয়াছে। এইবার দুইখানি বোর্ডেরই মাঝখানে

এমন ভাবে এক একটি ছিদ্র করিয়া দাও যাহাতে দীপশিখা ও ছিদ্র দুইটি এক সরল রেখায় পড়ে। এখন ছিদ্রের মধ্য দিয়া নজর করিলে শিখাটি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। যদি দূরবর্ত্তী বোর্ডখানি সরাইয়া তাহার স্থানে একটি ঘষা কাচের পর্দ্দা বসাইয়া দাও ত দেখিবে যে পর্দ্দার উপর দীপশিখার একটি উল্টা প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীপশিখার কোন এক স্থান হইতে নিঃসৃত আলোকরশ্মি প্রথম পর্দ্দার ছিদ্রের মধ্য দিয়া সরল পথে চলিয়া দ্বিতীয় পর্দ্দার উপর পতিত হইয়া উহার অল্পপরিসর অংশ আলোকিত করে। এইরূপ দীপশিখার প্রত্যেক স্থান হইতে নিঃসৃত আলোক রেখার দ্বারা পর্দ্দার উপর এক নির্দ্দিষ্ট সামান্য অংশ আলোকিত হওয়ায় দীপশিখার উল্টা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। আলোক যদি বক্রপথে চলিতে পারিত, তাহা হইলে ঐরূপ দীপশিখার প্রতিবিম্ব গঠিত না হইয়া পর্দ্দার অনেকাংশ সাধারণভাবে আলোকিত হইত।

ছায়া (Shadow)—আলোকের গতিপথে কোন অস্বচ্ছ পদার্থ থাকিলে আলোক-রশ্মি সেই অস্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ করিয়া যাইতে

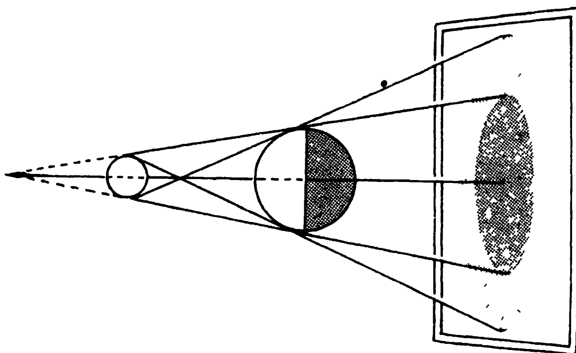


৩১। ছায়া

পারে না। অস্বচ্ছ পদার্থের পিছনের স্থানটি অন্ধকারময় হয়। এই অন্ধকারময় স্থানটিকে ঐ অস্বচ্ছ পদার্থের ছায়া কহে।

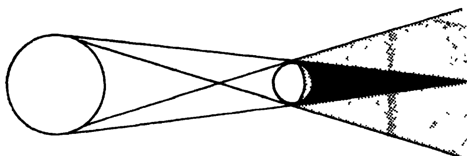
প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া—আলোকের উৎস দীপটি যদি ক্ষুদ্র এবং অস্বচ্ছ পদার্থটি আকারে অতি বড় হয়, তাহা হইলে যে ছায়া পড়ে তাহা ঘন কাল হয়। এরূপ ছায়াকে **প্রচ্ছায়া** (umbra) কহে।

যদি দীপটি আকারে বড় ও অস্বচ্ছ পদার্থটি ছোট হয় তাহা হইলে দুই প্রকার ছায়া পড়ে। মধ্যে ঘন কাল প্রচ্ছায়া, আর তাহার চারিদিকে



৩২। প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া

যে পাতলা ছায়া পড়ে তাহাকে **উপচ্ছায়া** (penumbra) কহে। উপচ্ছায়ার মধ্যে কিছু আলোক আসে বলিয়া উহাকে পাতলা দেখায়।



৩৩। আলোকের উৎস অতি বড় ও পদার্থটি ছোট

আলোকের উৎস প্রকাণ্ড এবং অস্বচ্ছ পদার্থটি ছোট হইলে পর্দ্দার উপর যে ছায়া পড়ে, তাহার বিস্তার পর্দ্দার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। পর্দ্দা অস্বচ্ছ পদার্থের নিকটে আনিলে ছায়া বড়, দূরে ক্রমশঃ ছোট, ও শেষে বিন্দুতে পরিণত হয়; আরও দূরে গেলে তাহার উপর আর কোনও ছায়া পড়ে না।

পাখী যখন সামান্য উঁচুতে উড়ে, তখন তাহার ছায়া দেখা যায়। যখন বহু উঁচুতে উড়ে, তখন আর তাহার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে সূর্য্য হইল আলোকের প্রকাণ্ড উৎস, পাখী ক্ষুদ্র অস্বচ্ছ পদার্থ, মাটি হইল পর্দ্দা।

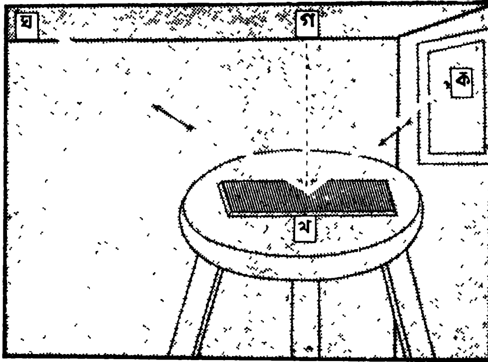
আলোকের প্রতিফলন (Reflection of light)

আলোকরশ্মি সরল রেখায় চলিবার পথে যদি ঐ রশ্মি কোন মসৃণ অস্বচ্ছ পদার্থ কর্ত্তৃক বাধা পায়, তবে উহার গতিপথের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তিত গতিপথটিও সরল। ইহাকে আলোকের **প্রতিফলন** (reflection) বলে। যে রশ্মিটি আলোক-উৎস হইতে আসিয়া মসৃণ পদার্থের উপর পড়ে তাহার নাম **আপতিত-রশ্মি** (incident ray) এবং যে রশ্মিটি মসৃণ পদার্থের উপর হইতে ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়, তাহার নাম **প্রতিফলিত-রশ্মি** (reflected ray)। মসৃণ অস্বচ্ছ পদার্থকে **প্রতিফলক** (reflector) বলে।

প্রতিফলকের উপর যেখানে আলোকরশ্মি আপতিত হয়, উহার নাম **পাতনবিন্দু** (point of incidence)। ঐ বিন্দু হইতে প্রতিফলকে লম্বরেখা টানিলে, উহাকে অভিলম্ব (normal) কহে। আপতিত রশ্মি এই অভিলম্বের সহিত যে কোণ করে তাহাকে **আপতন কোণ** (angle of incidence) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ঐ অভিলম্বের সহিত যে কোণ করে, তাহাকে **প্রতিফলন কোণ** (angle of reflection) বলে।

নির্দ্দিষ্ট দুইটি নিয়মানুসারে আলোকের প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে। —(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

(২) আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান। আলোকরশ্মি যদি লম্বভাবে আয়নার উপর আপতিত হয় তবে উহা লম্বের বিপরীতদিকে প্রতিফলিত হয়। আপতিত-রশ্মি সমস্তটাই প্রতিফলিত হয় না। উহার কতকটা প্রতিফলক শোষণ করিয়া থাকে।

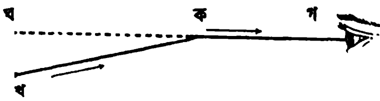


৩৪। সূর্য্যালোকের প্রতিফলন

ঘরেব দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অন্ধকার কর। জানালার ছিদ্র দিয়া যে আলোক রশ্মি আসিতেছে তাহা আয়নার উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। এখানে 'কখ' আপতিত-রশ্মি, 'খঘ' প্রতিফলিত রশ্মি ও 'খগ' অভিলম্ব। বিশেষ যন্ত্র সাহায্যে দেখান যায় যে আপাতন কোণ কখগ এবং প্রতিফলন কোণ গখঘ সমান।

বিভিন্নমুখী রশ্মি (divergent ray) ও প্রতিবিম্ব (image)—আলোক-রশ্মি যখন কোন পদার্থ হইতে সরল পথে বরাবর আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে তখন পদার্থটি যে স্থানে আছে সেই স্থানেই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু প্রতিফলিত-রশ্মি যে দিক

হইতে আসিতেছে তাহার বিপরীত দিকে সরল রেখা টানিলে ঐ রেখার উপর একস্থানে পদার্থটিকে দেখা যায়। যে পদার্থটিকে দেখা যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে ঐ পদার্থ নহে, তাহা ঐ পদার্থের প্রতিবিম্ব (image)। প্রতিফলক হইতে পদার্থের দূরত্ব যেই মত, প্রতিফলকের পশ্চাতে ঠিক সেইমত দূরে তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আয়নায় এইরূপ প্রতিবিম্ব দেখা যায়। 'ক' একটি প্রতিফলক, 'খ' একটি পদার্থ। উহা হইতে আপতিত-রশ্মি 'খক' প্রতিফলকের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রতিফলিত রশ্মি 'কগ' চোখে পৌঁছিতেছে। এখন পদার্থটিকে 'খ' স্থানে না দেখিয়া 'ঘ' স্থানে দেখা যাইবে। এই 'ঘ' স্থানে যে পদার্থটি দেখা যাইবে, সেটি 'খ' স্থানে স্থিত পদার্থের প্রতিবিম্ব। পুকুরে এই জন্যই ধারের গাছপালার প্রতিবিম্ব জলের মধ্যে দেখা যায়।

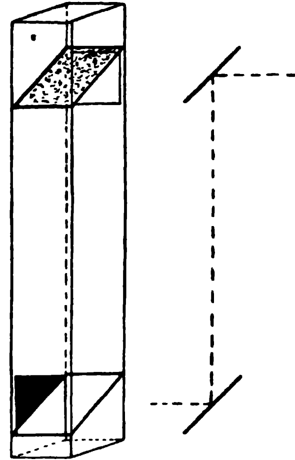


৩৫। প্রতিবিম্ব

বাজারের ফ্রেমওয়ালা আয়না কতটা মোটা জানিতে হইলে তাহার উপর আঙ্গুল রাখিলে আঙ্গুলের প্রতিবিম্ব যদি খুব কাছে পড়ে ত বুঝিবে আয়নার কাচখানা অতি পাতলা। কাচ পুরু হইলে প্রতিবিম্বও দূরে পড়িবে। কাচের ঘনত্ব কত ঠিক জানিতে হইলে আঙ্গুল ও তাহার প্রতিবিম্বের দূরত্বের অর্দ্ধেক করিলেই ঠিক জানা যায়। আয়নায় আমাদের ডানদিক প্রতিবিম্বের বামদিক, আমাদের বাম দিক প্রতিবিম্বের ডান দিক। সেজন্য সোজাভাবে কাগজে উ লিখিয়া আয়নার উপর খাড়াভাবে ধরিলে উহার উল্টা প্রতিবিম্ব পড়ে।

এক প্রতিফলিত রশ্মিকে অনেক আয়নার সাহায্যে বার বার প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। ফলে একই পদার্থের নানা প্রতিবিম্ব পাওয়ার সম্ভাবনা।

ফুটবলের মাঠে ভিড়ের পিছন হইতে দেখিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র উঁচু করিয়া ধরা হয় যাহার সাহায্যে সামনে মানুষের ভিড়ের বাধা থাকা সত্ত্বেও মাঠের খেলা দেখা সম্ভব হয়। এই যন্ত্রকে **পেরিস্কোপ** বলে। পেরিস্কোপে দুইটি দর্পণ ভূমিতলের সহিত ৪৫° কোণ করিয়া এমন ভাবে লাগান থাকে যে উপরের দর্পণে নীচের দিকে ও নীচের দর্পণে উপর দিকে মুখ দেখা যায়। আমরা যখন কোনও পদার্থ দেখি তখন উহা হইতে আলোক-রশ্মি আসিয়া চোখে পড়ে, পদার্থটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। মাঠ হইতে আগত আলোক-রশ্মি উপরের আয়নার নীচের দিকে প্রতিফলিত হয়, আবার নীচের আয়নার উপর দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হইয়া চোখে আসাতে লোকে মাঠের ফুটবল খেলা ভিড়ের পিছন হইতেও দেখিতে পারে।


৩৬। পেরিস্কোপ

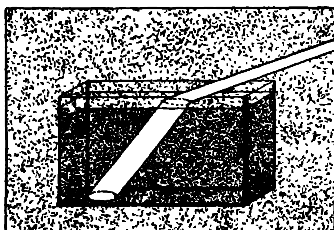
ডুবোজাহাজে (Submarine) এই পেরিস্কোপের সাহায্যে জলের বাহিরের অবস্থা সব দেখা যায়।

বিক্ষিপ্ত রশ্মি (diffused light)—প্রতিফলক মসৃণ না হইলে আপতিত রশ্মি নানাদিকে এলোমেলো ভাবে প্রতিফলিত হয়। এই প্রকার প্রতিফলিত রশ্মিকে বিক্ষিপ্ত রশ্মি কহে। এখানে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিফলকটিকে দেখা যায়। যেখানে সূর্য্যরশ্মি পড়ে না সেখানে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি পড়িতে পারে। সেকারণ

এইরূপ বিক্ষিপ্ত-রশ্মির দ্বারা আমরা সচরাচর ঘরের আসবাব পত্র দেখিতে পাই। সেগুলি মসৃণ হইলে তাহাদের প্রতিবিম্বও দেখা যাইত।

আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of light)

জল, কাচ, বাতাস সবই স্বচ্ছ পদার্থ। স্বচ্ছ সমসত্ব মাধ্যমের (homogeneous medium) মধ্য দিয়া আলোক রশ্মি সরল পথে চলে। কিন্তু যখন আলোকরশ্মি কোন স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর সোজা চলিতে চলিতে অপর আর এক স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর চলিতে আরম্ভ করে, তখন দ্বিতীয় পদার্থের প্রবেশ পথে একটু বাঁকিয়া আবার সরল পথে চলিতে থাকে। আলোকের গতিপথের এই পরিবর্ত্তনের নাম আলোকের **প্রতিসরণ** (refraction)। আপতিত-রশ্মি যখন এক মাধ্যম হইতে অপর মাধ্যমের উপর খাড়া ভাবে পড়ে তখন প্রতিসরণ হয় না। উহা ঋজু পথেই গমন করিয়া থাকে।



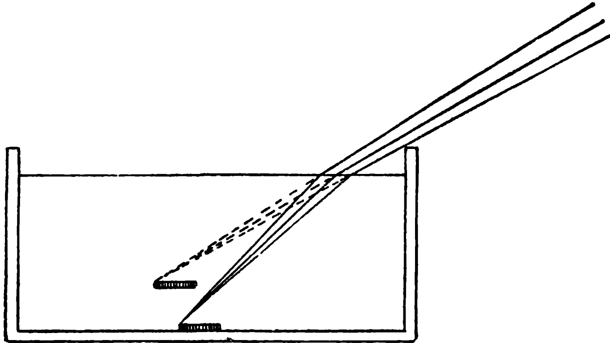
৩৭। আলোক জলে প্রবেশমাত্র বাঁকিয়া গেল

প্রতিসরণ-পরীক্ষা—(১ একটি কাচপাত্রে জল আছে। তাহার উপর আপতন আলোক-রশ্মি বাঁকাভাবে আসিয়া পড়িল। বাতাস স্বচ্ছ, তাহার ভিতর দিয়া রশ্মি সরল রেখায় আসিয়া স্বচ্ছ জলে পড়িল। আর এখন সরল রেখায় চলিতে পারিবে না, জলে প্রবেশের পথে একটু বাঁকিয়া যাত্রা করিবে। যেখানে আলোক রশ্মি জলে প্রবেশ করিয়াছে সেই পাতনবিন্দুতে জলের সমতলের উপর

একটি লম্ব টানিলে দেখা যাইবে যে আলোকরশ্মি জলের মধ্যে ঐ লম্বের দিকে হেলিয়া গিয়াছে।

আলোক-রশ্মি যখন লঘুতর মাধ্যম হইতে ঘনতর মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন উহা লম্বের দিকে হেলিয়া থাকে। কিন্তু যদি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে যায়, তখন উহা লম্ব হইতে দূরে হেলিবে। বাতাসের ঘনত্ব জল হইতে লঘু। সেজন্য আলোক-রশ্মি জলে প্রবেশ মাত্র বাঁকিয়া লম্বের দিকে হেলিয়া পড়ে।

(২) একটি পাত্রে জল রাখিয়া দেখা যায়, আপতন-রশ্মি খাড়াভাবে পড়িলে আর বাঁকিবে না, জলের মধ্যে খাড়া ভাবে দেখা যাইবে।



৩৮। জলমগ্ন টাকাটি উঁচুতে দেখা যাইতেছে

(৩) পাত্রস্থিত জলের মধ্যে একটি টাকা রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমরা যখনই কোন পদার্থ দেখি, তখন সেই পদার্থ হইতে আলোক-রশ্মি আমাদের চোখে পড়াতে তবে সেই পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। টাকার নিজস্ব দীপ্তি নাই কিন্তু বাহিরের

আলোকে আলোকিত হইয়া আলোকরশ্মি নির্গত হয়। জলের মধ্যের টাকা হইতে আলোক-রশ্মি জলের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া বাতাসে প্রবেশ করিল। বায়ু জল অপেক্ষা হালকা, সেজন্য জল হইতে বায়ুতে আসিবামাত্র আলোকরশ্মি, পাতন-বিন্দুতে জলের সমতলের উপর লম্ব টানিয়া জলের মধ্যে বাড়াইয়া দিলে যে অভিলম্ব হয়, তাহা হইতে দূরে হেলিয়া পড়ে। আমাদের চোখে এই পরিবর্ত্তিত আলোক-রশ্মি আসে। সেজন্য টাকাটা যথাস্থানে না দেখিয়া আমরা তাহা কিঞ্চিৎ উপরে দেখিতে পাই।

এই একই কারণে একগাছা লাঠি খানিকটা জলে বাঁকাভাবে ডুবাইলে যেস্থানে লাঠিটা জলে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে উহা দুমড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(৪) একটি লাঠি জলের মধ্যে খাড়াভাবে ডুবাইলে একটুও বাঁকিবে না। জলের মধ্যেও খাড়া দেখা যাইবে অর্থাৎ প্রতিসরণ হইবে না।

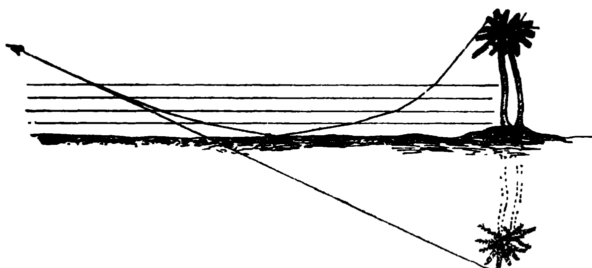
আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ—আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যে যে কোণের সৃষ্টি হয়, তাহাকে আপতন কোণ (angle of incidence) এবং প্রতিসরণ-রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যে যে কোণের সৃষ্টি হয়, তাহাকে প্রতিসরণ কোণ (angle of refraction) কহে।

নির্দ্দিষ্ট দুইটি নিয়মানুসারে আলোকের প্রতিসরণ ঘটিয়া থাকে।

(১) আপতন-রশ্মি, প্রতিসরণ-রশ্মি এবং অভিলম্ব এক সমতলে থাকে।

(২) আপতন কোণ ছোট বড় হইলে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে প্রতিসরণ কোণও ছোট বড় হইবে।

মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা-রাশির সংস্পর্শে তাহার উপরিস্থ বায়ুস্তর হাল্কা হয় এবং তাহারও উপরিস্থ বায়ুস্তরের সহিত ঘনত্বের প্রভেদ ঘটে। মরুভূমিতে দূরে গাছপালা থাকিলে তাহা হইতে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি বায়ুস্তরের মধ্যে প্রতিসৃত হইয়া যখন মৃগ বা মানবের চোখে পড়ে, তখন সে গাছের তলায় গাছের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। গাছ ও গাছের



৩৯। মরীচিকা

প্রতিবিম্ব একসঙ্গে দেখাতে মনে হয় নিশ্চয়ই ঐ স্থানে জলাশয় আছে, তাহা না হইলে গাছ ও তাহার প্রতিবিম্ব দুইই দেখা যাইত না। ইহাকে **মৃগতৃষ্ণিকা** (mirage) কহে।

মরুভূমির দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশির মধ্যে প্রচণ্ড রৌদ্রে তৃষ্ণাকাতর মৃগ সম্মুখে মিথ্যা জলাশয় দেখিয়া পাগলের মত সেই দিকে ছুটিয়া যায়। সে ত বুঝিতে পারে না যে উহা মায়াজলাশয়! জলাশয়ের দিকে যত যায় জলাশয় তত দূরে পালায়। অবশেষে পিপাসাতুর, শ্রান্ত, অর্দ্ধমৃত মৃগ সেই তপ্ত বালিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে।

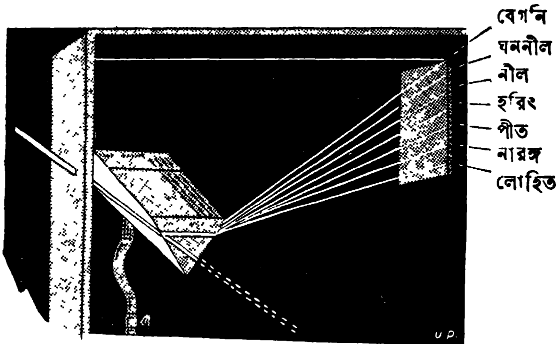
নাবিকেরা সময় সময় সমুদ্রমধ্যে জাহাজে থাকিয়া সমুদ্রতীরস্থ নগরের প্রতিবিম্ব আকাশের গায় দেখিতে পায়; তাহারও কারণ আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ।

বর্ণ ও রামধনু

বর্ণ-বৈচিত্র্য ও আলোক—সকল পদার্থেরই একটা নিজস্ব বর্ণ আছে। এই বর্ণভেদের সহিত আলোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে আলোক-শক্তি ঈথরের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আর সেই তরঙ্গ চক্ষুতে প্রবেশ করিলে আমরা আলোকোদ্ভাসিত পদার্থ দেখিতে পাই। আলোকদ্বারা যতগুলি তরঙ্গের সৃষ্টি হয় সবগুলিব **তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য** (wave-length) সমান নহে। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হইতে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। লোহিতবর্ণের তরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বেগনি বর্ণের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। অন্ততঃ, যে তরঙ্গগুলি আমরা চক্ষে ধরিতে পারি, তাহার এই দুই সীমা। **অব-লোহিত** (infra-red) বা **অতি-বেগনি** (ultra-violet) বলিয়া যে কিরণ আছে তাহা বিজ্ঞান-জগতে পরিচিত হইলেও আমাদের দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত। যে বর্ণগুলি আমরা দেখিতে পাই তাহারা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে সাত ভাগে বিভক্ত—বেগনি, ঘননীল, নীল, হরিৎ, পীত, নারঙ্গ ও লোহিত (violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red)। রামধনুতে এই সাতটি বর্ণই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যের সাদা আলোতে এই সাতটি বর্ণই আছে। ইহাদের সংমিশ্রণেই সাদা বর্ণ উৎপন্ন হয়।

আলোক বিচ্ছুরণ (Dispersion of light)—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন (Newton) সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান সূর্য্যের আলোক-রশ্মি কাচের ত্রিফলকের বা প্রিজমের (prism) মধ্য দিয়া যাইবার সময় বাতাস হইতে কাচ ও কাচ হইতে বাতাস এই দুই প্রকার মাধ্যমের দ্বারা

দুইবার প্রতিসৃত হইয়া অপরদিকে যে শুধু বাঁকিয়া বাহির হয় তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত ৭টি উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই বর্ণমালাকে **বর্ণালী** (spectrum) কহে। সাতটি আলোক যখন



৪০। আলোক বিচ্ছুরণ

বিচ্ছুরিত হয়, তখন উহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে বাঁকিয়া যায় ও সে কারণ উহাদিগকে বর্ণালীতে পৃথক্‌ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ণ (colour)—জবা গাছের পাতা সবুজ কেন, জবাফুল লাল কেন? সূর্য্যের সাদা আলো জবা ফুলের উপর পড়িলে জবাফুল একপ্রকার তরঙ্গ ব্যতীত অপর সকল তরঙ্গ শোষণ করিয়া লয়। জবাফুল যে তরঙ্গ শোষণ করে না সেই তরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। তাই জবাফুল লোহিত বর্ণ দেখি। পাতা যে তরঙ্গ শোষণ করে না তাহা সবুজের জন্মদাতা। অতএব পাতা সবুজ। তোমার লিখিবার কাগজ কোন তরঙ্গই শোষণ করে না, তাহাতেই সে সাদা। কাল আলপাকার কাপড় সমস্ত তরঙ্গ

শোষণ করে, তাহাতেই সে কাল। এই জন্যই বৈজ্ঞানিকগণ কাল বর্ণের পদার্থকে বর্ণহীন বলেন।

লাল আলোকে লাল ফুল দেখিলে ফুলের বর্ণ আরও লাল দেখায়। কারণ লাল ফুল লাল আলো ব্যতীত অন্যান্য আলো শোষণ করে। সবুজ আলোকে লাল ফুল দেখিলে উহা কাল দেখাইবে, কারণ লাল ফুল সবুজ-রশ্মি শোষণ করিবে। উহা হইতে আর কোনও আলোক প্রতিফলিত হইবে না।

মিশ্রবর্ণ—পৃথিবীতে উপরি উক্ত সাত বর্ণ ছাড়া আরও অনেক বর্ণ আছে। তাহারা সকলই মিশ্র বর্ণ। রামধনুর সাত বর্ণের মধ্যেও মিশ্র বর্ণ আছে। যথা, সবুজ = নীল + পীত, ইত্যাদি। সময় সময় মাত্র দুইটি বর্ণ মিশ্রিত হইয়া শ্বেতবর্ণ উৎপন্ন হয়। যথা—হরিৎ ও লোহিত, নারঙ্গ ও নীল, ইত্যাদি। ইহাদের একটি বর্ণকে অন্যটির পরিপূরক বর্ণ কহে।

রামধনু (Rainbow)—দিনের বেলায় খানিক বৃষ্টি হওয়ার পরই যখন রৌদ্র উঠে তখন সূর্য্যের বিপরীত দিকে আকাশের গায় সাত বর্ণের রামধনু দেখা যায়। বৃষ্টির অল্প পরে বায়ুমণ্ডলে যে সকল জলকণা থাকে তাহারাই প্রিজমের কাজ করে। সূর্য্যরশ্মি ঐ সকল জলকণা দ্বারা বিচ্ছুরিত হইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে আকাশের গায় যে বর্ণালীর সৃষ্টি করে তাহাই রামধনু। সেজন্য পূর্ব্বাহ্নে পশ্চিম আকাশের গায় ও অপরাহ্নে পূর্ব্বাকাশের গায় রামধনু দেখা যায়। সে সময় সূর্য্য যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে থাকে। সূর্য্য দিগন্ত হইতে খুব উঁচুতে থাকিলে রামধনু দেখা যায় না, সে কারণ ঠিক দুপুরে রামধনু হয় না। রামধনু সর্ব্বদাই ধনুকের আকৃতি হয় এবং তাহার উপর দিকে লাল ও নীচের দিকে বেগনি বর্ণ থাকে।

Questions.

1. How would you prove that light travels in a straight line?
2. What is reflection of light? Give examples.
3. What do you mean by refraction of light? Give examples.
4. Why does a stick appear bent when it is immersed in water?
5. Explain the formation of mirage.
6. How is a rainbow produced?

ষষ্ঠ অধ্যায়

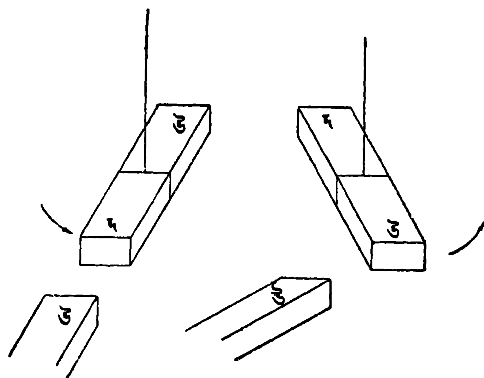
চুম্বক (Magnet)

চুম্বক পাথর (Lodestone)

চুম্বক পাথরের সহিত মানবের পরিচয় বহুকালের। এই পাথর এক লৌহঘটিত খনিজ পদার্থ। এসিয়া মাইনর, সুইডেন ও স্পেন দেশের খনিতে চুম্বক পাথব পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশের লোকেরা ইহার অদ্ভুত গুণাবলী প্রথম লক্ষ্য করেন। এই প্রস্তর এক খণ্ড সূতা দিয়া ঝুলাইয়া দিলে তাহা সকল অবস্থাতেই উত্তর দক্ষিণে লম্বা হইয়া ঝুলিবে, এবং তাহার সন্নিকটে লৌহখণ্ড ধরিলে সেই লৌহখণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইবে। এই পদার্থের যে দিকটা উত্তরদিকে থাকে তাহাকে **উত্তর মেরু** (North Pole), এবং তাহার যে দিকটা দক্ষিণদিকে থাকে তাহাকে **দক্ষিণ মেরু** (South Pole) বলা হয়। মেরু দুইটি যোগ করিয়া যে রেখা কল্পিত হয়, উহাকে চুম্বকের **মেরুদণ্ড** (axis) বলা হয়। এই ম্যাগনেটাইটকে খানিকটা লৌহচূর্ণের মধ্যে যদি ডুবান হয় ত দেখিবে যে দুই প্রান্তে অনেক লৌহচূর্ণ আটকাইয়া রহিয়াছে।

মধ্যবর্ত্তী স্থানে আকর্ষণ ক্রমেই কম এবং ঠিক মাঝখানে আকর্ষণশক্তি একেবারেই নাই।

চুম্বকের আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি (Magnetic attraction and repulsion)—দুই খণ্ড চুম্বকের পরস্পর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিবার ক্ষমতাকে চৌম্বক শক্তি বলে।



৪১। চুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

চুম্বকের আর একটা গুণ উল্লেখযোগ্য। দুইটি চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে একের উত্তর মেরু (উ) অন্যের উত্তর মেরুর নিকটে লইয়া গেলে উহারা পরস্পর দূরে সরিয়া যায়। অর্থাৎ উত্তর মেরু উত্তর মেরুকে বিক্ষিপ্ত করে, আকর্ষণ করে না। সেইরূপ একের দক্ষিণ মেরু (দ) অন্যের দক্ষিণ মেরুকে বিক্ষিপ্ত করিবে, আকর্ষণ করিবে না। কিন্তু উভয় মেরুই সাধারণ লৌহকে সমান আকর্ষণ করে। এক চুম্বকের উত্তর মেরু অপর চুম্বকের বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুকে খুব জোরে আকর্ষণ করে। মোট কথা, **সমমেরুর মধ্যে বিকর্ষণ ও বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ চুম্বকের একটি স্বভাবজাত ধর্ম্ম।**

বিভিন্ন পদার্থের চুম্বকত্ব—লোহা, ইস্পাত, নিকেল, প্রভৃতি ধাতব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং ইহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। কাঠ, কাগজ, কাচ, দস্তা, তামা প্রভৃতি পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না বা ইহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করা যায় না। কিন্তু চুম্বক ও লৌহের মাঝখানে কাগজ বা কাচ প্রভৃতি রাখিলেও চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

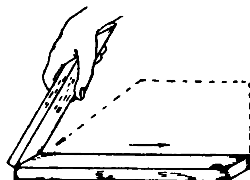
কৃত্রিম চুম্বক—প্রাচীনেরা চুম্বক পাথরকেই চিনিতেন, কৃত্রিম চুম্বকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল না। আজ পণ্ডিতেরা কৃত্রিম চুম্বকের সন্ধান পাইয়াছেন।

চুম্বকন ঃ বিদ্যুৎ-চুম্বক

(Magnetisation : Electro-Magnet)

চুম্বকন—একখণ্ড সাধারণ লোহাকে চুম্বকের যে কোনও মেরু দ্বারা একদিক হইতে অন্যদিক পর্য্যন্ত কয়েকবার ঘষিলে ঐ লোহার মধ্যে চৌম্বক শক্তির আবির্ভাব হইবে।

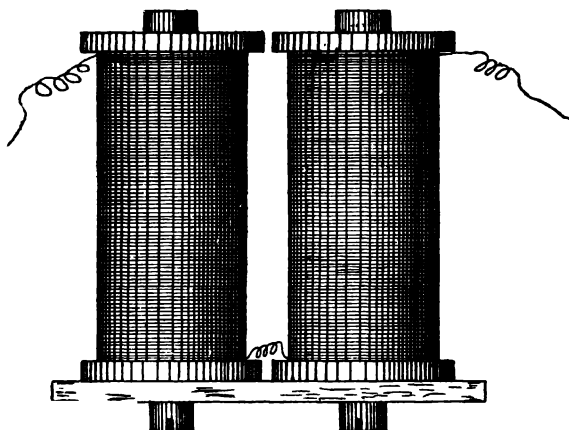
কিন্তু সঠিক প্রণালীতে ঘষা চাই। চুম্বকের যে মেরু দিয়া ঘষিতে আরম্ভ করিয়াছ সেই মেরু দিয়াই ঘষিতে হইবে। সাবধান, অন্য মেরু দ্বারা ঐ লৌহকে স্পর্শ করিতে নাই। শক্তিশালী চুম্বক এইভাবে বেশী পাওয়া যায় না।



৪২। লৌহকে চুম্বকিত করা

বিদ্যুৎ-চুম্বক—স্থায়ী শক্তিমান চৌম্বকশক্তি প্রস্তুতকরণে বৈদ্যুতিক শক্তি আবশ্যক। খানিকটা রেশমসূত্র পরিবেষ্টিত বিজলীর তার লইয়া একটি কাচের নলের চারিদিকে জড়াও, যেমন কাটিমে

সূতা জড়ান থাকে। একখণ্ড লোহার তার বা সরু লোহার কাঠি ঐ নলের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দাও। বাহিরের বিজলীর তারে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাও। তারপর লোহার কাঠিটি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে লোহা চুম্বক হইয়া গিয়াছে। ইহাকে **বিদ্যুৎ-চুম্বক**



৪৩। বিদ্যুৎ-চুম্বক

(Electro magnet) কহে। ঐ লোহা যদি অঙ্গারবিহীন (soft iron) হয় ত চুম্বকশক্তি থাকিবে না। কিন্তু যদি কার্ব্বন মিশ্রিত লৌহ অথবা ইস্পাত হয়, তবে তাহার চুম্বকশক্তি একরকম স্থায়ী হইয়া যাইবে। একটি কোমল লৌহের কাঠির চারিদিকে বিজলীর তার জড়াইয়া জোরে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাও; যতক্ষণ বিদ্যুৎ-স্রোত বহিবে ততক্ষণ মাত্র সেই কাঠি চুম্বকের মত কাজ করিবে। কিন্তু স্রোত বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চৌম্বক শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। এই বিদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (electric bell) ও টেলিগ্রাফের কল কাজ করে।

চৌম্বক শক্তি নষ্টের উপায়—কৃত্রিম উপায়ে যেমন চুম্বক তৈয়ার করা যায়, তেমনই কৃত্রিম উপায়ে চৌম্বক শক্তি নষ্টও করা যায়। একখণ্ড চুম্বক লইয়া আগুনে দাও, কিছুক্ষণ পরে দেখিবে সে সাধারণ লোহা হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাপশক্তির প্রভাবে চৌম্বক শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। যদি আগুনে না দিয়াও কয়েকবার জোরে আছড়াইয়া ফেল বা নাড়া দাও তাহা হইলেও চৌম্বক শক্তি নষ্ট হইবে।

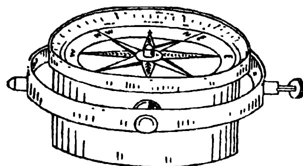
ভূচুম্বকত্ব ও দিগ্‌দর্শী

ভূচুম্বকত্ব—চুম্বককে ঝুলাইলে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করিয়া দাঁড়ায় কেন? কারণ তাহার এক প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর মেরুর দ্বারা এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণ মেরুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আমাদের **পৃথিবী নিজে একটি প্রকাণ্ড চুম্বক**। তাই সে চুম্বক পাথরকে বা চুম্বক লৌহকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করিয়া রাখে।

দিগ্‌দর্শী (Compass)—চুম্বককাঠির মাঝখানে সূতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলে উহা উত্তর দক্ষিণে লম্বা হইয়া ঝুলিবে। চুম্বকের এই গুণ আছে বলিয়াই compass বা দিগদর্শী প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। সমুদ্রে চলাচলের সময় দিগ্‌ভ্রম হইলে নানারূপ বিপদের সম্ভাবনা। এই যন্ত্র নির্মিত হওয়ার পূর্ব্বে নাবিকগণ ধ্রুবতারা দেখিয়া জাহাজ চালাইতেন। কিন্তু তাহাতেও বিপদ ছিল অনেক। একে ত দিনের বেলায় তারা দেখা যায় না, তার উপর ঝড়বাদলার সময় যখন দিক্ নির্ণয়ের বেশী প্রয়োজন তখন ধ্রুবতারা মেঘের আড়ালে লুকাইয়া থাকে।

জাহাজের দিগ্‌দর্শী এমন স্থানে রাখা হয় যে নিকটে কোন লোহার জিনিস না থাকে। যন্ত্রটি দেখিতে ঘড়ির মত। উপরে

কাচের ঢাকন। তাহার নীচে গোল কাগজের চাকতি। চাকতির পরিধির উপর ৩৬০° ডিগ্রী আঁকা ও চাকতিটি ৩২ ভাগে বিভক্ত। নীচে একটি পাতলা অথচ জোরাল চুম্বক এমন ভাবে আঁটা আছে যে উহা সহজেই ঘুরিতে ফিরিতে পারে। চুম্বক ও চাকতি এক **অ্যাগেট পাথরের** (agate) কীলকের উপর আলগা ভাবে রহিয়াছে। অ্যাগেট দেওয়া এই জন্য যে, উহা ঘষায় সহজে ক্ষয় হইবে না। জাহাজ যে মুখে ইচ্ছা ঘুরুক ফিরুক চুম্বক উত্তর দক্ষিণে মুখ করিয়া থাকিবেই। জাহাজের কাপ্তেন ইহার সাহায্যে যখন ইচ্ছা দিক নির্ণয় করিতে পারেন।



৪৪। দিগ্‌দর্শী

Questions.

1. What is a lodestone?
2. How can you prepare a magnet? What substances can be converted into magnets?
3. What is an electro-magnet? How can it be prepared? Mention its different uses.
4. What is a compass? What is it used for?
5. How would you prove that the earth is a magnet?

বিদ্যুৎ (Electricity)

বিদ্যুৎ—ইহা একপ্রকার শক্তি। তাপ, শব্দ ও আলোক যেমন শক্তি, বিদ্যুৎও তেমনই এক শক্তি। আবার এই শক্তি সহজেই তাপ, শব্দ ও আলোকে পরিণত হইতে পারে। মেঘের সহিত মেঘের সংঘর্ষে এই শক্তি উৎপন্ন হয়। ইহার গর্জ্জন ও দীপ্তি সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। গাছ কি বাড়ীর উপর বিজলী পড়িয়া যখন গাছ ও বাড়ী জ্বালাইয়া দেয়, তখন ইহার তাপ বা দাহিকা শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষ এই বিদ্যুৎশক্তিকে নানা কাজে লাগাইয়াছে। আজকাল ট্রেন পর্য্যন্ত বিদ্যুতের জোরে চলে। কত বড় বড় কারখানা চালায় এই বিদ্যুৎ শক্তি! ইহারই জোরে ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে। ইহারই সাহায্যে টেলিফোন টেলিগ্রাফ কত দূরে দূরে সংবাদ বহন করিতেছে। ক্ষুদ্র টর্চ্চ বাতিটি পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে বিজলীর শক্তিতে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ ও বেতার বার্ত্তা—বিদ্যুৎ যখন তার দিয়া বহিয়া যায় তখন তাহাকে **বিদ্যুৎপ্রবাহ** কহে। তোমরা যে রেডিও শোন, তাহা আলোকজাতীয় একপ্রকার বিকিরণের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হয়। এই বৈদ্যুতিক বিকিরণ দেশবিদেশ হইতে যে সংবাদ লইয়া আসে তাহার নাম **বেতার বার্ত্তা**।

বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব পরীক্ষা—(১) একটা গালার কাঠিকে পশমী কাপড় দিয়া ঘষ, বিদ্যুৎ শক্তির আবির্ভাব হইবে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ এত অল্প যে ইহার **স্ফুলিঙ্গ** (spark) দেখিতে পাইবে না, তবে গালার কাঠিটা অক্লেশে ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করিবে।

(২) শীতকালে শুক্‌না চুলে গাটাপার্চ্চা চিরুণী দিয়া মাথা আচড়াইবার সময় পট্ পট্ শব্দ হয়। সেই সময় চিরুণীটি লইয়া সূক্ষ্ম কাগজকুচির নিকট ধরিলে কুচিগুলি ছুটিয়া আসিয়া চিরুণীর গায়ে লাগিয়া যায়। এই পরীক্ষাব মূলেও আছে ঘর্ষণ দ্বারা বিদ্যুৎসৃষ্টি। পশমী কাপড়ের যেখানটা দিয়া গালা ঘষিয়াছ, সেখানটা কাগজের টুকবার কাছে লইয়া যাও, দেখিবে কাপড়েও আকর্ষণী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু কাপড় ও গালা একসঙ্গে কাগজখণ্ডের কাছে লইয়া গেলে দেখিবে যে, কোন আকর্ষণী শক্তি নাই। গালাতে যে বিদ্যুৎশক্তি আসিয়াছে ও কাপড়ে যে বিদ্যুৎশক্তি আসিয়াছে দুটি দুই আলাদা রকমের। বৈজ্ঞানিক ডুফে (Dufay) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন যে প্রথমটি **ধনাত্মক** (positive), দ্বিতীয়টি **ঋণাত্মক** (negative)। চুম্বকের মেরুদ্বয়ের পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণের ন্যায় এই ধনাত্মক বিদ্যুৎ বিশিষ্ট একটি পদার্থ অন্য একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎ বিশিষ্ট পদার্থকে বিকর্ষণ করে ও অপর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বিশিষ্ট পদার্থকে আকর্ষণ করে। চিরুণীর সূক্ষ্ম কাগজ আকর্ষণের মূলেও এইরূপ দুই জাতীয় বিদ্যুতের পরস্পর আকর্ষণ নিহিত আছে। কারণ বিদ্যুৎবিশিষ্ট চিরুণী নিকটে আনিবামাত্র কাগজের যে অংশ চিরুণীর নিকটবর্ত্তী, ঐ অংশে বিপরীত জাতীয় বিদ্যুতের সঞ্চার হয়। যদি সমপরিমাণে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ একই স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের প্রভাব বিপরীত হওয়ায় দূরবর্ত্তী পদার্থের উপর কোন প্রভাব দেখা যায় না। তাহাতেই গালা ও কাপড় একত্র করিলে কাগজ টানে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই দুই বিজয়শক্তি একত্র রহিয়াছে, সেজন্য ধরা পড়ে না। অন্য শক্তির প্রয়োগ দ্বারা যখন দুইটিকে আলাদা করা যায় তখন তাহারা দুইটিই ধরা পড়ে।

বিদ্যুৎশক্তির প্রকার ভেদ—দুই প্রকার বিদ্যুৎ শক্তি আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। এক প্রকার—যাহা উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে উহাকে **ঘর্ষ-বিদ্যুৎ** (frictional electricity) বলে ; দ্বিতীয় প্রকারকে **চল-বিদ্যুৎ** (current electricity) বলে।

চল-বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ যখন গতিশীল হয়, তখন উহা কোন পদার্থের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহিত বিদ্যুৎকে চল-বিদ্যুৎ কহে।

চল-বিদ্যুতের আকস্মিক আবিষ্কার—ইটালির শারীর বিদ্যার অধ্যাপক গাল্‌ভানি (Galvani) পরীক্ষার নিমিত্ত ব্যাঙের একখণ্ড মাংসপেশীকে লবণ জলে ভিজাইয়া বারান্দার রেলিংয়ের উপর তামার তারে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল যে বাতাসে মাংসপেশী যখনই বারান্দার লোহার রেলিংয়ে ঠেকিতেছে তখনই পেশীর সঙ্কোচ ঘটিতেছে। গাল্‌ভানি ইহা লক্ষ্য করিলেন মাত্র। বৈজ্ঞানিক ভল্টা (Volta) ইহা হইতে নির্ণয় করেন যে, তামার তার লোহার রেলিং ও লবণ জলের সংস্পর্শে আসায়, বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং পেশীর সঙ্কোচন ঘটিয়াছে।

চল-বিদ্যুতের পরীক্ষা—একটি টাকা ও একটি ডবল পয়সা লও। প্রথমটিকে জিহ্বাগ্রের উপরে, দ্বিতীয়টিকে নীচে, এমন ভাবে ধর, যেন তাহারা জিহ্বার বাহিরে পরস্পরকে ছুঁইয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ তোমার জিহ্বা চিন্ চিন্ করিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতেই বুঝিতে পারিবে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে।

বিভব-প্রভেদ—(potential difference)—স্রোত বহে কেন? উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে জল বহিয়া যায় ইহা তোমরা

নিত্য দেখিতেছ। অর্থাৎ উচ্চতার তারতম্য না থাকিলে স্রোত বহিবে না। বিদ্যুতেরও এই নিয়ম। ফলতঃ, যখনই বিদ্যুৎ-প্রবাহ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সঞ্চালিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে পদার্থ দুইটির বিদ্যুৎ-শক্তির একটা তারতম্য আছে। এই তারতম্যকে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন **বিভব-প্রভেদ** (potential difference)। যে পদার্থের **বিভব** (potential) উচ্চ, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন বিভব যুক্ত পদার্থে বিদ্যুৎ-স্রোত বহিয়া যায়। এইজন্য বিদ্যুতাধার প্রস্তুত করিতেও সকল সময়ই দুইটি দণ্ড প্রয়োজন হয়।

বিদ্যুতাধার (Electric cell)

নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যায়। যে পাত্রে এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎসৃষ্টির ব্যবস্থা থাকে, তাহাকে **বিদ্যুতাধার** (electric cell) কহে।

একটি কাচ বা চীনামাটির পাত্রে জল মেশান সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া তাহার মধ্যে এক খণ্ড দস্তাব পাত ডুবাইয়া রাখ। পরে ঐ দস্তার পাতে না ঠেকে এমন করিয়া একটি তামার পাতও অ্যাসিডে ডুবাও। এইরূপে সেল প্রস্তুত হইল। এখন দুই পাতকে একখণ্ড তারের দ্বারা বাহিরে সংযুক্ত করিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ আরম্ভ হইবে।

কিন্তু মনে রাখিও, পাত দুটি অ্যাসিডের মধ্যে যেন পরস্পরকে স্পর্শ না করে। বাহিবে তার দ্বারা সংযোগ না হইলে বিদ্যুৎস্রোত বহিবে না। একবার এইরূপে সেল প্রস্তুত করিলে তাহা কিন্তু চিরদিন চলিবে না। অনবরত ব্যবহারের ফলে ইহার জোর ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে।

বিদ্যুৎ পরিবাহী ও বিদ্যুৎ অন্তরক

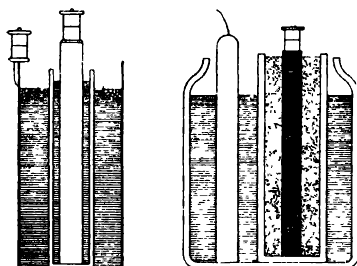
(Conductors and Insulators)

বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অপরিবাহী—বিদ্যুতাধারের সংযোগ তার কিসের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত? কাঠ, কাচ, রবার দ্বারা পাত দুইটিকে জুড়িলে দেখিবে বিদ্যুৎ চলিবে না। অথচ ধাতব পদার্থ দ্বারা জুড়িলে বিদ্যুৎ বেশ প্রবাহিত হইবে। কাঠ, কাচ, রবারের মত দ্রব্যকে **অপরিবাহী** (non-conductor) বলা হয়। রূপা, তামা, লোহা, ইত্যাদিকে **পরিবাহী** (conductor) বলা হয়। আধারের তার তাহা হইলে বিদ্যুৎ-পরিচালক পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া চাই। ধাতুর মধ্যে রৌপ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচালক, তাহার পরেই তাম্র। রৌপ্য দুর্ম্মূল্য বলিয়া তামার তারই বিজলীর কাজে ব্যবহৃত হয়। তারের উপর রবার ঢাকা থাকে বা রেশম-সূত্র জড়ান থাকে। এই রবার ও রেশমকে **অন্তরক** (insulator) বলা হয়। তাহা হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহ নষ্টও হয় না, বিদ্যুৎ লাগিয়া লোকের অনিষ্টও হইতে পারে না।

ভল্টার সেল প্রস্তুত-করণ ও ভল্টা প্রবাহ—বৈজ্ঞানিক ভল্টা (Volta) একখণ্ড কাগজকে ভিনিগারে ভিজাইয়া টিনের চাকতি ও রূপার চাকতির মধ্যে স্থাপন করিয়া, তার দ্বারা উভয় চাকতিকে সংযুক্ত করিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করিলেন। ইহাই হইল প্রথম সেল এবং নাম হইল **ভল্টার সেল** (Voltaic cell)। বিদ্যুৎ-প্রবাহের নাম হইল **ভল্টার প্রবাহ** (Voltaic current)।

সেল প্রস্তুত-করণ—বিভিন্নপ্রণালীতে সেল (cell) প্রস্তুত করা হয়। তুঁতে জলে গলাইয়া একটি তাম্রনির্ম্মিত আধারে

ঢালিয়া দেওয়া হয়; এবং ঐ আধারের দুই পাশে দুইটি তাকের উপর কয়েকখণ্ড তুঁতে রাখা হয়। এখন উহার ভিতর অপর একটি স্বল্পপরিসর ও **সচ্ছিদ্র** (porous) চীনামাটির পাত্রে একটি দস্তার দণ্ড জলমিশ্রিত সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া রাখা হয়। বাহিরের পাত্রটিই দ্বিতীয় দণ্ডের কার্য্য করে। এই সেলের নাম **ডানিয়েল সেল**।



৪৫। ডানিয়েল ও লেক্লান্সি সেল

অন্য একপ্রকার সেল টেলিগ্রাফ আফিসে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। একটি চীনামাটির পাত্রে নিশাদল জলে গুলিয়া উহাতে একটি দস্তাব দণ্ড ডুবাইয়া বাখা হয়। এই পাত্রের মধ্যে আর একটি অল্প পরিসব সচ্ছিদ্র চীনামাটির পাত্রে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্‌সাইড (manganese dioxide) পরিবেষ্টিত অঙ্গারদণ্ড থাকে। ইহাকে **লেক্লান্সি সেল** বলে।

বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্রিয়া (Effects of Current)

১। **বিদ্যুৎ প্রবাহে তাপের উদ্ভব**—(Heating effect of electric current)—সেল হইতে পরিবাহী তার দ্বারা বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইলে ঐ পরিবাহী তারটি গরম হইয়া পড়ে। ব্যাটারী হইতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত হইলে ঐ তার এত গরম হয় যে

হাত দেওয়া যায় না। এই ভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি হইতে তাপ পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক ষ্টোভে বা ইস্ত্রীতে একটি দীর্ঘ সরু তারের কুণ্ডলী থাকে। তাহার ভিতর দিয়া যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন উহা গরম হইয়া উঠে। সেই উত্তাপে রান্না বা জামা ইস্ত্রী হয়।

২। **বিদ্যুৎ প্রবাহে আলোকের উৎপত্তি** (Production of light by electric current)—ধাতুর সরু তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও শেষে ঐ উত্তপ্ত তার আলোক বিকিরণ করে। অধিক উত্তপ্ত ধাতুর তার বায়ুর সংস্পর্শে পুড়িয়া ভস্মীভূত হয় বলিয়া বৈদ্যুতিক আলোতে সূক্ষ্ম তারটি বায়ুশূন্য একটি কাচ পাত্রের (bulb) মধ্যে রাখা হয়।

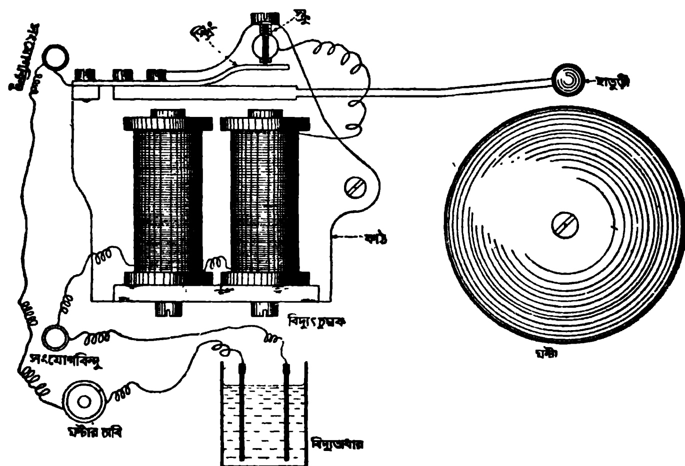
৩। **বিদ্যুৎ প্রবাহের রাসায়নিক ক্রিয়া** (Chemical effect of electric current)—জলের দুই উপাদান—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এক গেলাস জলে একটু সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া তাহাতে বিদ্যুতাধারের তারের দুইটি মুখ একটু দূরে দূরে ডুবাইয়া দাও। তার দুইটির গা দিয়া বুদ্‌বুদ উঠিবে। উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে একদিকে হাইড্রোজেন উঠিতেছে, অপর দিকে অক্সিজেন। বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করার নাম বিদ্যুদ্‌বিশ্লেষণ (electrolysis)।

শুধু জল কেন, বহু পদার্থের এরূপ বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে। তুঁতের একটি উপাদান হইল তামা। তুঁতের জল বিদ্যুৎ প্রবাহে বিশ্লেষণ করিলে একদিকে উহার উপাদান তামা জমা হয়। এই প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা চামচ, ছুরি, কাঁচিকে নিকেল করা হয়।

৪। **বিদ্যুৎপ্রবাহের চুম্বক ক্রিয়া** (Magnetic effect of electric current)—বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা যে চুম্বক প্রস্তুত

করিতে পারা যায় তাহার কথা চুম্বকের প্রস্তুতকরণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করায় উহার চুম্বক-ধর্ম্মপ্রাপ্তি ঘটে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাম চলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, বড় বড় কল কারখানা ও মটর প্রভৃতি চলিতেছে। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ সবই ইহার উপর নির্ভর করে।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা—(Electric bell)—ঘণ্টার সংযোগ বিন্দুর সহিত একটি চাবির ভিতর দিয়া বিদ্যুতাধারের সংযোগ করিয়া দাও। চাবিতে চাপ দিলেই বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া বিদ্যুৎ-চুম্বক

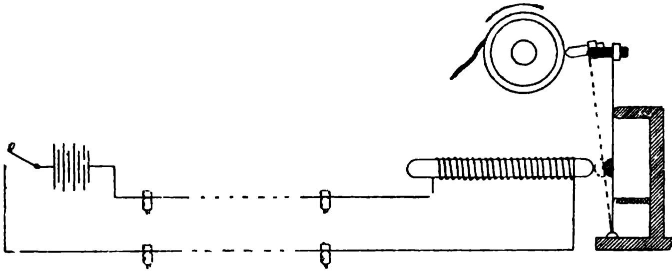


৪৬। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিভিন্ন অংশ

সৃষ্টি করায় হাতুড়িসংলগ্ন কোমল লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া স্ক্রু হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িবে এবং ঘণ্টায় একটি আঘাত লাগিবে। স্ক্রু হইতে হাতুড়িটি বিযুক্ত হওয়ায় সংযোগ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া আর বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হয় না। ইহার ফলে বিদ্যুৎ-চুম্বকটি আর হাতুড়ির

কোমল লৌহকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না, তাই স্প্রিংয়ের জোরে হাতুড়িটি পুনরায় স্ক্রু স্পর্শ করিলেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া পুনরায় ঘণ্টায় ঘা পড়ে ও এই ভাবে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা চলিতে থাকে।

টেলিগ্রাফ যন্ত্র (Telegraph apparatus)—সভ্যজগতে এই যন্ত্র একান্ত আবশ্যক। এই যন্ত্রের প্রথম প্রয়োজনীয় অঙ্গ, দুই স্থানে রক্ষিত দুইটি বিদ্যুতাধার, ও এই দুই আধারের সংযোগ সাধন করে এমন তার। দ্বিতীয়, একটি প্রেরক যন্ত্র ও তৃতীয়, গ্রাহক যন্ত্র। পূর্ব্বে প্রেরক (sender) ও গ্রাহকের (receiver) মধ্যে দুইটি তার দ্বারা যোগ থাকিত। এখন একটি মাত্র সংযোগ



৪৭। টেলিগ্রাফ যন্ত্র

তার থাকে। দ্বিতীয়টির পরিবর্ত্তে উভয়স্থানে এক একটি ধাতুখণ্ড তার বাঁধিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয়। ইহাতে দ্বিতীয় তারের খরচ বাঁচিয়া যায় ও মাটি উৎকৃষ্ট বিদুৎ-পরিচালক হওয়াতে কাজের কোন ক্ষতি হয় না।

প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র এইরূপ ভাবে প্রস্তুত যে প্রেরক একটি কল টিপিয়া দিলেই দুই স্থানের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হয়।

ফলে গ্রাহকযন্ত্রের বিদ্যুৎ-চুম্বক কার্য্যকরী হইয়া যন্ত্রসংলগ্ন একটি কোমল লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করে। গ্রাহকযন্ত্রে খট্ করিয়া একটা আওয়াজ হয়। ঘণ্টার বর্ণনা কালে তোমাদিগকে বলা হইয়াছে যে লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইলেই বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হইয়া যায় ও লৌহখণ্ড আবার একটি আওয়াজ করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যায়। এইরূপ টক্ টকা টক্ আওয়াজ করিয়া বর্ণমালার অক্ষরগুলির সঙ্কেত নির্দ্দেশ করা হয়। ইচ্ছা করিলে একটি ঘুরন্ত কাগজের রোলারের উপর হ্রস্ব ও দীর্ঘ দাগ দ্বারা বর্ণমালার অক্ষরগুলির সঙ্কেত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

Questions

1. What are the different forms of electricity?
2. What do you mean by conductor and non-conductor of electricity? Give examples.
3. State some practical applications of electricity with regard to its (a) heating, (b) lighting, (c) chemical and (d) magnetic effects.
4. Describe an electric bell. How does it work?
5. State the general principles of Telegraphy.

রসায়ন-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ তত্ত্ব

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ

(Elements and Compounds)

রসায়ন-বিদ্যা (Chemistry)—যে বিজ্ঞান সাহায্যে পদার্থের নানারূপ স্থায়ী পরিবর্ত্তন, পরিণতি এবং বিভিন্ন পদার্থের প্রস্তুতকরণ-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে রসায়ন-বিদ্যা কহে।

রসায়নশাস্ত্র মতে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ—যে সকল পদার্থ আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়ত দেখিতেছি, রসায়নশাস্ত্র মতে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—**মৌলিক** (elements) অর্থাৎ মূল বা আদি পদার্থ, যাহাতে দ্বিতীয় কোন পদার্থের লেশমাত্র নাই, এবং **যৌগিক** (compounds) অর্থাৎ যাহা দুই বা ততোধিক পদার্থের যোগদ্বারা গঠিত, যাহা বিশ্লেষণ করিলে এই বিভিন্ন পদার্থগুলি পৃথক ভাবে পাওয়া যায়।

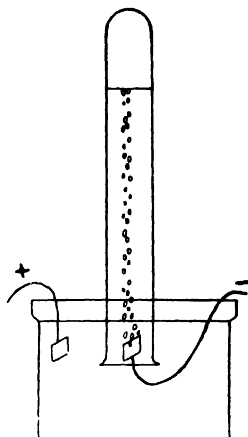
মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ—মৌলিক পদার্থ আজ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা বিরানব্বই। গন্ধক, অঙ্গার, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ, এলুমিনিয়ম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ। লৌহ বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে তাহার উপর যে মরিচা পড়ে, তাহা

যৌগিক পদার্থের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। ইহা লৌহ ও বাতাসের অক্সিজেন যোগে গঠিত। এই মরিচার মধ্যে লৌহ আর লৌহ অবস্থায় নাই, অক্সিজেনও আর অক্সিজেন অবস্থায় নাই। দুইয়ের মিলনে এক নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

যৌগিক পদার্থের পরীক্ষা—(১) লোহিতবর্ণ অক্সাইড অব মার্কারি **পরীক্ষানল** (test tube) মধ্যে গরম করিলে **অক্সিজেন** বাহির হইবে। গরম করিবার সময় ইহার মধ্যস্থ পারদও বাষ্পাকারে বাহির হইয়া আসিবে ও টিউবের উপরভাগে কাচের গায়ে লাগিয়া যাইবে। কি করিয়া জানিবে অক্সিজেন বাহির হইতেছে? একখণ্ড গন্‌গনে গরম লোহার তার টিউবের মধ্যে ঢুকাও, চারিদিকে আগুনের ফিনকি উড়িবে। ছোট এক টুকরা জ্বলন্ত অঙ্গার চিমটা দিয়া ঢুকাইলেও দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

(২) খানিকটা জল লইয়া একটি কাচ কুপীতে ফুটাও। জলটা ফুটিবে ও ধীরে ধীরে বাষ্পাকারে বাহির হইতে থাকিবে। কিন্তু যে বাষ্প বাহির হইতেছে তাহা জলের বায়বীয় অবস্থা। একটি ঠাণ্ডা বাটি মুখের কাছে ধরিলে ঐ বাষ্প তাহাতে লাগিয়া আবার ফোঁটা ফোঁটা জলে পরিণত হইবে। একটি লোহার নল আগুনে তাতাইয়া লাল করিয়া লও। জলীয় বাষ্প এইবার একটি কাচের নলের সাহায্যে এই তপ্ত লোহার নলের মধ্য দিয়া চালাও। তাহার অপর মুখ দিয়া একটি বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ বাহিরে আসিতে থাকিবে বটে, কিন্তু তাহা আর জলীয় বাষ্প নয়। ঠাণ্ডা বাটি সামনে ধর, জল জমিবে না। এই বায়বীয় পদার্থটি কি? ইহার নাম **হাইড্রোজেন**। ইহা একটি বর্ণহীন, লঘু, সহজদাহ্য, বায়বীয় পদার্থ, জলের অন্যতম উপাদান। বিদ্যুতাধারের তারের

দুই মুখ জলে ডুবাইলে দুই মুখে বুড়বুড়ি ওঠে আগে বলিয়াছি। একদিকে বুড়বুড়ি এই হাইড্রোজেনের, অপর দিকে অক্সিজেনের। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই মৌলিক পদার্থ মিলিয়া সৃষ্টির প্রাক্কালে জল নামক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছিল। ইচ্ছা করিলে তোমরা দুই শিশি হাইড্রোজেন (H) ও এক শিশি অক্সিজেন (O) মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বিজলীর স্ফুলিঙ্গ চালাইলে জলের সৃষ্টি করিতে পার। জলের রাসায়নিক সঙ্কেত H_2O অর্থাৎ যে পদার্থের প্রত্যেক অণুকণায় দুইভাগ H ও একভাগ O আছে।



৪৮। বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত-করণ

পদার্থের সাধারণ মিশ্রণ ও রাসায়নিক যোগ

(Mechanical mixture and Chemical compound)

সাধারণ মিশ্রণ—একটি পাত্রে খানিকটা লোহাচুর ও খানিকটা গন্ধকগুঁড়া রাখিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া দাও। যখন বেশ মিশিয়া গেল, তখন শুধু চোখে দেখাইবে যেন তাহার চেহারা ও রং সমস্তই অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, ঐ মিশ্র দ্রব্যটির মধ্যে গন্ধককণা ও লৌহকণা পাশাপাশি রহিয়াছে, মিশিয়া এক হয় নাই, অনায়াসে পৃথক্ করা যায়। একটি জোরালো চুম্বক লইয়া পাত্রটির মধ্যে বারবার ঘুরাও, দেখিবে সমস্ত লোহাচুর পৃথক্ হইয়া চুম্বককে আকড়াইয়া ধরিবে, গুঁড়া গন্ধক পড়িয়া থাকিবে। ইহা হইতেই

ঠিক বুঝা গেল যে দুই পদার্থের কোন রাসায়নিক যোগ ঘটে নাই। এই প্রকার মিশ্রণকেই **সাধারণ মিশ্রণ** বলা হয়।

যৌগিক পদার্থ—কিন্তু মিশ্র দ্রব্যটি পরীক্ষানলে রাখিয়া গরম করিলে এক সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইবে যাহার উপর চুম্বকের কোন প্রভাবই দেখা যাইবে না। এবার যাহা ঘটিল তাহা মিশ্রণ নয়, রাসায়নিক যোগ। নূতন পদার্থটি **যৌগিক** (chemical compound)। ইহার নাম—ফেরাস্ সাল্‌ফাইড (ferrous sulphide)।

যৌগিক পদার্থের বিশেষ লক্ষণ—যৌগিক পদার্থের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহার উপাদানগুলি একেবারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। কিছুতেই অন্যথা হয় না। লোহাচুর ও গন্ধকের সহজ মিশ্রণে কতটুকু লোহা ও কতটুকু গন্ধক থাকিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। প্রত্যেক দ্রব্যের যতটুকু ইচ্ছা লইয়া মিশাইতে পার। কিন্তু যেই রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা এই দুই দ্রব্যের মিলন ঘটিল অর্থাৎ ফেরাস্ সাল্‌ফাইড উৎপন্ন হইল, অমনই তাহার মধ্যের লোহা ও গন্ধকের ভাগ একেবারে বাঁধা, নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। প্রতি এগার ভাগ ফেরাস্ সাল্‌ফাইডে সাত ভাগ লোহা ও চারি ভাগ গন্ধক থাকিতেই হইবে। ইহাই রসায়নের নিয়ম। তোমার পাত্রে যদি আট ভাগ লোহাচুর ও চারি ভাগ গন্ধক রাখ তবে লোহাচুরের সাত ভাগ মাত্র গন্ধকের সহিত মিলিত হইবে, বাকী এক ভাগ অপরিবর্ত্তিত লোহারূপেই পড়িয়া থাকিবে।

তেমনই জলের (H_2O) মধ্যে কত হাইড্রোজেন (H), কত অক্সিজেন (O) থাকিবে তাহা একেবারে নির্দ্দিষ্ট। জলের অক্সিজেনভাগের ওজন হাইড্রোজেনের আট গুণ। তাই, আঠার ভাগ (ওজন) জল

লইলে তাহার মধ্যে সর্ব্বদা দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও ষোল ভাগ অক্সিজেন থাকিবে। ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

সাধারণ মিশ্রণ ও যৌগিক পদার্থের তুলনা :

সাধারণ মিশ্রণ	যৌগিক পদার্থ
১। উপাদানগুলি মিশিয়া এক হয় না।	১। উপাদানগুলি মিশিয়া এক হইয়া যায়।
২। যান্ত্রিক উপায়ে উপাদান-গুলিকে পৃথক্ করা যায়।	২। যান্ত্রিক উপায়ে উপাদান-গুলিকে পৃথক্ করা যায় না।
৩। উপাদানের পরিমাণ নানা প্রকার হইতে পারে।	৩। উপাদানের পরিমাণ একেবারে নির্দ্দিষ্ট।
৪। উপাদানগুলির প্রত্যেকটির নিজস্বগুণ মিশ্রিত অবস্থাতেও বর্ত্তমান থাকে।	৪। যৌগিক পদার্থের গুণ ও উহার উপাদানগুলির গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।
৫। উপাদানগুলি মিশ্রিত হইবার কালে তাপের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না।	৫। উপাদানগুলি যৌগিকে পরিণত হইবার কালে তাপের পরিবর্ত্তন হয়।

Questions

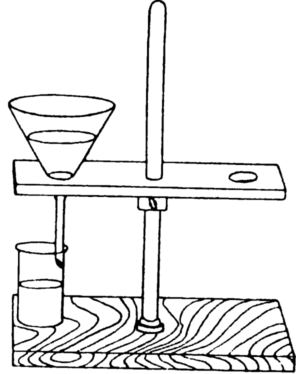
1. What is an element? Give examples.
2. How does a chemical compound differ from a mechanical mixture?

সাধারণ মিশ্রণের পৃথক্ করণ
(Separation of Mixtures)

১। **দ্রবণ** (Solution)—অনেক মিশ্রণ আছে যাহাদের উপাদানগুলি দ্রবণ ক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক্ করা যায়। এক গেলাস জলে এক মুষ্টি বালি ফেলিয়া দিলে এক রকমের মিশ্রণ হইবে, আবার এক মুষ্টি নুন বা চিনি ফেলিয়া দিলে আর এক রকমের মিশ্রণ হইবে। বালি ত জলে গলিবে না, যেমনকার তেমনই রহিবে। কিন্তু চিনি গলিবে, অর্থাৎ চিনির কণা জলের কণার মধ্যে এরূপ ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইবে যে, অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু জল লইয়া জিহ্বায় দিলে সে জলও মিষ্ট লাগিবে। বালি মিশ্রিত জল পরীক্ষা করিলে বালি স্পষ্ট দেখা যাইবে, কিন্তু সরবতের চিনির অস্তিত্ব ধরা পড়িবে না। সকল কঠিন পদার্থই দ্রবণীয় নহে, এবং যাহাতে গলে তাহাও সকল দ্রব্যের পক্ষে এক নহে। কোন পদার্থ জলে গলে, কোন পদার্থ স্পিরিটে গলে, কোন পদার্থ বা আর কোনও পদার্থে গলে। কোন পদার্থকে তরল পদার্থে গলাইলে মিশ্র পদার্থটিকে **দ্রবণ** (Solution), যে পদার্থটি দ্রবীভূত হইয়াছে তাহাকে **দ্রাব্য** (Solute), আর যাহাতে দ্রব হয় তাহাকে **দ্রাবক** (Solvent) বলা হয়।

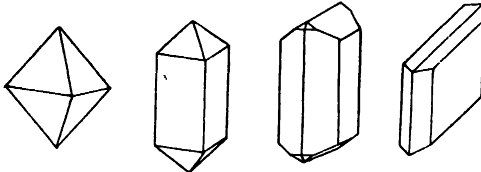
এক গেলাস জলে একটু একটু করিয়া চিনি ফেলিতে থাক। চিনি গলিতে গলিতে এমন অবস্থায় আসিবে যে, দেখিবে আর চিনি তাহাতে গলিতেছে না। ইহাকে **সম্পৃক্ত দ্রবণ** (Saturated solution) কহে। উত্তপ্ত কর, দেখিবে যে গরম হইলে উহাতে সহজেই আরও চিনি গলিতেছে। তাহা হইলে কোন তরল পদার্থ কতটুকু দ্রব্য গলাইতে পারে, তাহা নির্ভর করিতেছে তাহার উষ্ণতার উপর।

২। **পরিস্রাবণ বা ছাঁকন** (Filtration)—বালি মিশ্রিত জল ফিল্টার কাগজ দিয়া ছাঁকিয়া লইলে বালির ভাগ কাগজে আটকাইয়া থাকিবে, জল নীচে পড়িয়া যাইবে। ফিল্টার কাগজটিকে গোল করিয়া কাটিয়া কাচের ফানেলে লাগাইতে হয়। এই ফানেলের সাহায্যে বালি মিশ্রিত জল হইতে জল ও বালি পৃথক্ করা যায়।


৪৯। ছাঁকন

একত্র মিশ্রিত বালি ও লবণের উপর জল ঢালিয়া সমস্তটা উত্তম রূপে ঝাঁকাইয়া এইরূপ ফিল্টার-কাগজযুক্ত ফানেলে ঢালিয়া দিলে বালি ফানেলে থাকিবে, লবণাক্ত জল নীচে চলিয়া যাইবে।

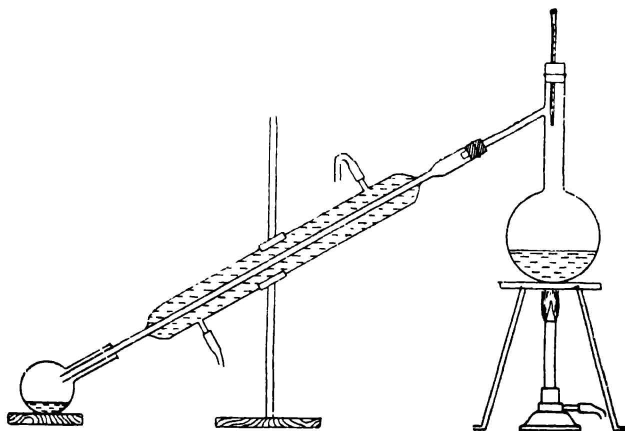
৩। **কেলাসন** (Crystallisation)—মিশ্রণ হইতে পদার্থবিশেষ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করিবার কেলাসন একটি প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বে


৫০। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দানা

বলিয়াছি যে দ্রাবকের উষ্ণতা বাড়িলে দ্রাব্য পদার্থের দ্রবণীয়তা বাড়ে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে চূণ প্রভৃতি দুই একটি জিনিস সম্বন্ধে উল্টা

নিয়ম, ইহারা শীতল জল অপেক্ষা উষ্ণ জলে কম গলে। জল গরম করিয়া তাহাতে যতটা পারিলে তুঁতে গলাইলে। এখন উষ্ণতা কমিলে সেই দ্রবণের অনেকটা তুঁতে দানা বাঁধিয়া নীচে পড়িয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়াকে **কেলাসন** (crystallisation) বলে। শুধু তুঁতে কেন, এইরূপে নানা পদার্থকে দানা বাঁধা বা **কেলাসিত** (crystalline) অবস্থায় আনা যায়।

৪। **পাতন** (Distillation)—লবণাক্ত জলের দুই উপাদান লবণ ও জল কিরূপে পৃথক্ করা যায়? হাঁড়িতে ফুটাইলে কিংবা রৌদ্রে



৫১। পাতন যন্ত্র

শুকাইলে লবণ ভাগ সমস্ত পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু জল বাষ্প হইয়া বাতাসে উড়িয়া যাইবে। যে যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত জলটাকেও পৃথক্ করিয়া ধরা যায়, তাহার নাম **পাতন যন্ত্র** এবং এই প্রক্রিয়ার নাম **চুয়ান** বা **পাতন** (distillation)। জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে উহা আবার জলে পরিণত হয়, এ কথা তোমরা পদার্থ-বিদ্যায় পড়িয়াছ।

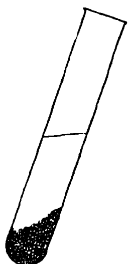
পাতন প্রক্রিয়ার অর্থ এই যে বাষ্পকে বাহিরে উড়িয়া যাইতে না দিয়া **শীতক** (condenser) নামক এক নলের মধ্য দিয়া চালাইতে হয়। শীতকের ভিতরের নলটি ঠাণ্ডা জলের দ্বারা বেষ্টিত থাকায় তাহার মধ্যস্থ বাষ্প জমিয়া জল হইতে থাকে। সেই জল ধীরে ধীরে বহিয়া গিয়া উহার অপর প্রান্তস্থ পাত্রে পড়ে।

খুব সাবধানে এই পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে যতটুকু জল লবণের সহিত মিশান হইয়াছিল, তাহার সমস্তটাই ফেরৎ পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই বড় বড় জাহাজের উপর সমুদ্রের নোনা জল হইতে বিশুদ্ধ পানীয় জল বাহির করা হইয়া থাকে।

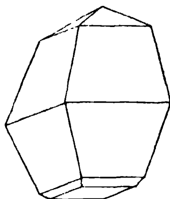
৫। **ঊর্দ্ধপাতন** (Sublimation)—তোমাদের বলা হইয়াছে যে, তাপের ফলে কঠিন পদার্থ তরল হয় ও তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু এমনও অনেক কঠিন পদার্থ আছে যাহারা তপ্ত হইলে একেবারে গ্যাস হইয়া যায়, তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ পদার্থের গ্যাস ঠাণ্ডা করিলে তাহাও একেবারে কঠিন হয়, তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। ইহার উদাহরণস্বরূপ কর্পূর ও আয়োডিনের (iodine) নাম করা যাইতে পারে। কর্পূর যে উবিয়া যায় ইহা তোমরা সকলেই জান। একটি পোর্সিলেন বেসিনের (porcelain basin) উপর কর্পূর রাখিয়া কাচের ঢাকনী দ্বারা ঢাকিয়া দাও। এখন বেসিনের নীচে সাবধানে তাপ দিলে দেখিবে যে কর্পূর উবিয়া গিয়া ঢাকনীর তলায় জমিয়া গিয়াছে। উবিয়া যাওয়ার পর পুনরায় ঘনীভূত করার বৈজ্ঞানিক নাম **ঊর্দ্ধপাতন** (sublimation)।

কর্পূর, বালি, লবণ ও লোহাচুর একত্র মিশাইয়া তোমাকে দেওয়া হইল। কি করিয়া উপাদানগুলিকে পৃথক্ করিবে? সর্ব্বাগ্রে ঊর্দ্ধপাতন দ্বারা কর্পূরভাগকে সংগ্রহ করিবে। তাহার পর

চুম্বকসাহায্যে লৌহচূর্ণ বাহির করিয়া লইবে। বাকী রহিল লবণ ও বালি, উহার উপর যথেষ্ট পরিমাণে গরম জল ঢাল। পরে সমস্তটাকে উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া ফিল্টারকাগজযুক্ত ফানেলে ঢাল। বালি ফিল্টার কাগজের উপর থাকিবে, নোনা জল নীচের পাত্রের মধ্যে চলিয়া যাইবে। এখন পাতনপ্রক্রিয়ার দ্বারা জল ও লবণকে পৃথক্ করিলে সব পদার্থই ফিরিয়া পাইবে।



৫২। গন্ধক মিশ্রিত লৌহ চূর্ণের উপর কার্ব্বন ডাই-সালফাইডের ক্রিয়া



৫৩। গন্ধকের দানা

৬। কাত করিয়া ঢালা (Decantation)—আগে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে একত্র মিশ্রিত গন্ধক ও লৌহচূর্ণ হইতে চুম্বক সাহায্যে কিরূপে লৌহচূর্ণ পৃথক্ করা যায়। আর এক উপায়, মিশ্রিত দ্রব্যের উপর খানিকটা কার্ব্বন ডাই-সালফাইড ঢালিয়া বেশ করিয়া নাড়। সমস্ত গন্ধকটা ডাই-সালফাইডে গলিয়া যাইবে, লোহাচুর নীচে পড়িয়া থাকিবে। দ্রবটি অন্য এক পাত্রে ঢালিয়া শুকাইয়া লও। গন্ধকের দানা পড়িয়া থাকিবে।

Questions

1. What is a solution? What do you understand by a saturated solution?
2. Describe the processes of filtration and sublimation.
3. What is distillation?
4. Describe the different methods of separating the constituents of a mixture.

দ্বিতীয় অধ্যায়

দহন

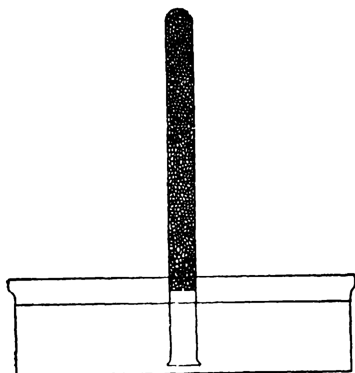
(Combustion)

দহন ক্রিয়া—দহনক্রিয়া বা পোড়ানর অর্থ কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেন গ্যাসের সংযোগ। বাতাসের কম বেশী এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন। দহন দুই প্রকার—**মৃদু দহন** ও **দ্রুত দহন**। দ্রুত দহনকেই সাধারণ কথায় পোড়ান বলে। মৃদু দহনে অগ্নিশিখা দেখা যায় না। একটা লোহার পেরেক বাহিরে পড়িয়া থাকিলে যে প্রক্রিয়ার ফলে মরিচাদ্বারা আবৃত হইয়া যায়, তাহাকেই বলা যাইতে পারে মৃদু দহন। একখণ্ড কাঠ পোড়াইলে দেখা যায় যে সামান্য একটু ছাই ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মোমবাতির মোম পুড়িলে ছাইও থাকে না। দেওয়ালির সময় বাজির দোকানে যে "ইলেকট্রিক তার" পাওয়া যায় তাহা ম্যাগনেসিয়ম ধাতুর নির্ম্মিত। আগুন ধরাইলে ইহা উজ্জ্বল সাদা আলো দিতে দিতে শীঘ্র পুড়িয়া যায়, একটু সাদা গুঁড়া পড়িয়া থাকে মাত্র। তামার তার আগুনে দিলে আলো জ্বলে না বটে, তবে তারটি ধীরে ধীরে কাল হইয়া যায়। এইগুলি সবই দ্রুত দহনের ফল।

অক্সিজেন না থাকিলে দহনকার্য্য চলে না—বায়ুতে অক্সিজেনের ভাগ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, ইহা ছাড়া যে অন্য একটি বায়বীয় পদার্থ ইহার প্রায় চারি-পঞ্চমাংশ ভাগ জুড়িয়া থাকে, তাহার নাম **নাইট্রোজেন গ্যাস**। অক্সিজেন গ্যাস দহন কার্য্যে সাহায্য করে, কিন্তু নাইট্রোজেন গ্যাস দহনের কোনও সাহায্য করে না।

লোহা, মোমবাতি, ম্যাগনেসিয়ম ও গন্ধকের দহন

পরীক্ষা—১। একটি দাগকাটা পরীক্ষানলে জল ঢালিয়া আবার ফেলিয়া দাও। ভিতরটা ভিজা থাকিতে থাকিতে উহার মধ্যে খানিকটা লোহাচুর দিয়া নাড়িয়া উপুড় কর। কিছু লোহাচুর নলের গায়ে আটকাইয়া থাকিবে, বাকীটা পড়িয়া যাইবে। এখন এই উপুড় করা নলটির মুখ জলে ডুবাইয়া দুই একদিন রাখিলে দেখিবে যে ধীরে ধীরে কাল লোহাচুর লাল হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ লোহাতে মরিচা ধরিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জলও নলের মধ্যে উপর দিকে উঠিতেছে। কেন এইরূপ হইল? পরীক্ষানলে যে বাতাস ছিল তাহার অক্সিজেনের সহিত লোহাচুরের রাসায়নিক মিলনফলে অর্থাৎ মৃদু দহনে মরিচা দেখা দিল এবং অক্সিজেনের শূন্যস্থান অধিকার করিতে বাহিরের বাতাসের চাপে পরীক্ষানলে জল উঠিল। জল যখন নলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ স্থান পূর্ণ করিবে, অর্থাৎ সব অক্সিজেন ফুরাইয়া যাইবে, তখন আর লোহাচুরের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে না এবং জলও আর উপরে উঠিবে না। অক্সিজেন শেষ হওয়ায় মৃদু দহনও শেষ হইবে।



৫৪। লোহাচুরের মৃদুদহন

২। একটি কাচপাত্রে কিছু জল লইয়া সেই জলের উপর একটি প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি বসাও। বাতিটি একটি বেল-জার দিয়া ঢাকিয়া

রাখিলে একটু পরেই দেখিবে মোমবাতির শিখাটি কমিয়া ক্রমে নিভিয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে, মোমবাতির কার্ব্বন ও হাইড্রোজেনের সহিত বাতাসের অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটায় বেল-জার মধ্যে অক্সিজেনের অভাব হইল।

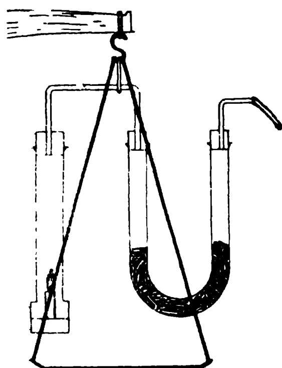
৩। একটি বেল-জার জলের উপর রাখিয়া উহার মধ্যে ম্যাগনেসিয়ম বা গন্ধক পোড়াইলে দেখা যায় যতক্ষণ সেই আবদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন ভাগ শেষ না হইবে ততক্ষণ দহনক্রিয়া চলিবে। দহনক্রিয়া শেষ হইলে দেখিবে তোমার জারের এক-পঞ্চমাংশ জলে ভরিয়াছে ও বাকী চারি-পঞ্চমাংশ খালি আছে। ঐ চারি-পঞ্চমাংশে জ্বলন্ত কাঠি প্রবিষ্ট করাইলে তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। উহার মধ্যে একটি জীবন্ত ইঁদুর ঢুকাইয়া দিলে সে অল্পক্ষণেই মরিয়া যাইবে। কেন না, অক্সিজেনের অভাবে দীপও জ্বলিবে না, জীবও বাঁচিবে না।

এই তিন পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত অন্য পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ সাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে, লোহা আয়রন অক্‌সাইড, মোমবাতির কার্ব্বন কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়ম ম্যাগনেসিয়ম অক্সাইড, গন্ধক সালফার ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়াছে। সালফার ডাই-অক্সাইড বায়বীয় পদার্থ। গন্ধক জ্বালাইলে উহার সবটাই ঐ গ্যাসরূপে পরিণত হয় বলিয়া, আর ছাই পড়িয়া থাকে না।

দহনের ফলে পদার্থের ওজন বৃদ্ধি হয়। কোন কোন স্থলে ওজন বৃদ্ধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—ম্যাগনেসিয়মের তার বা তামার তার যদি আগে ওজন করিয়া লওয়া হয়, ও পুড়িবার পরে দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থটাকে ওজন করা যায়, তবে দেখিবে যে ওজন বেশী হইয়াছে। যেটুকু ওজন

বাড়িয়াছে তাহা যুক্ত অক্সিজেনের, অর্থাৎ বায়ু হইতে যে অক্সিজেন ইহারা দহনের সময় আত্মসাৎ করিয়াছে তাহারই ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী বৈজ্ঞানিক **ল্যাভয়সিয়র** এইরূপ পরীক্ষার ফলে অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। গন্ধক, বিশুদ্ধ কয়লা, বা মোম পোড়াইলে কিছু কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ মোম, অঙ্গার বা গন্ধক অক্সিজেন-যুক্ত হইয়া বায়বীয় পদার্থ হওয়ায় বাতাসে মিশিয়া যায়। কাঠের মধ্যে যে অঙ্গারভাগ আছে তাহা জ্বলিয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়, কিন্তু যে ধাতব ভাগ আছে তাহা ভস্মরূপে পড়িয়া থাকে।

মোমবাতি জ্বালানের ফল—একটি লম্বা কাচের চিমনির তলার মুখ এক ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়া বন্ধ কর। উপর মুখও আর একটি ছিপি দিয়া বন্ধ কর, ও সেই ছিপির মধ্যে একটি বাঁকা কাচের নল পরাইয়া কাচের নলের বাহিরের মুখের সহিত একটি U-নল জুড়িয়া দাও। U-নলের এক বাহুতে কষ্টিক-পটাশ, অন্য বাহুতে ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড আছে। এইবার চিমনির মধ্যে মোমবাতি ঢুকাইয়া সর্ব্বসমেত ওজন করিয়া সেটা সাবধানে জ্বালাও।

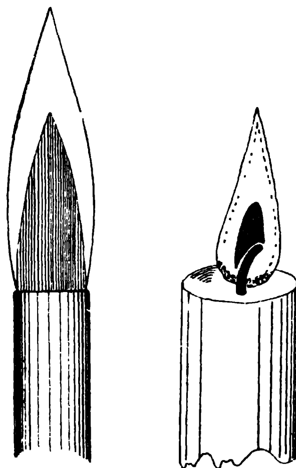


৫৫। মোমবাতি জ্বালাইলে উহার ওজন বৃদ্ধি হয়

এখন U-নলটির সহিত এক বায়ু-শোষক যন্ত্র জুড়িয়া আস্তে আস্তে টানিলে দেখিবে যে, চিমনির নীচের ছিদ্র দিয়া বায়ু ঢুকিয়া চিমনির মধ্য দিয়া U-নলের পথে সেই বায়ু পাম্পে চলিয়া আসিবে। মোমবাতি নিভিবে না, ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বলিতে

থাকিবে। U-নলে ঢুকিবামাত্র দহনের ফলে উৎপন্ন কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প যথাক্রমে কষ্টিক-পটাশ ও ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড শোষণ করিবে। মোমবাতিটি সমস্ত পুড়িয়া গেলে পর আবার ওজন কর, দেখিবে যে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ওজন বেশী হইয়াছে। যেটুকু বাড়িয়াছে সেইটুকু অক্সিজেনের ওজন। উপরে যে জলীয় বাষ্পের কথা বলিয়াছি, তাহা আসিল কোথা হইতে বলিতে পার? মোমবাতির একটি উপাদান হাইড্রোজেন। এই হাইড্রোজেন পোড়াইলে যে যৌগিক পদার্থ হয় তাহা হাইড্রোজেনের অক্সাইড, অর্থাৎ H_2O বা জল।

মোমবাতি জ্বলিবার সময় আমরা যে শিখাটি দেখিতে পাই তাহা কি প্রকারে উদ্ভূত হয়—প্রথমে জ্বলন্ত সলিতাটির উত্তাপে মোম গলিয়া দ্রব হয়, পরে ঐ দ্রবীভূত মোম **কৈশিক আকর্ষণে** (capillary attraction) সলিতাদ্বারা উপরে উঠিতে থাকে। তপ্ত স্থানে পৌছিবামাত্র এই গলিত মোম গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাসের সহিত বায়ুস্থ অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে তাপ ও আলোকের সৃষ্টি হয়। যে স্থানে ইহা ঘটে সেইটিই দীপশিখা।



৫৬। বুনসেন দীপ ও মোমবাতি

একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যায় যে, দীপশিখার মধ্যে এমন একটি স্থান আছে যাহা অপেক্ষাকৃত শীতল; যেখানে দহন নাই।

বুনসেন দীপ (Bunsen burner) জ্বালিলেও শিখার মধ্যে এইরূপ দহনশূন্য স্থানের অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়।

দ্রুত দহনে অগ্নিশিখা দেখা দেয়, মৃদু দহনে দেয় না। কিন্তু মৃদু দহনে তাপ বৃদ্ধি পায় কি? যদি তাহা না পাইত, তবে মানবদেহের ৯৮·৪° ডিগ্রী উষ্ণতা কোথা হইতে আসিত? আসল কথা, দহন যতই মৃদু হউক তাপ উৎপন্ন হইবেই। লোহাতে মরিচা পড়িবার সময়েও তাপ বৃদ্ধি হয়, তবে সে বৃদ্ধির পরিমাণ এত অল্প যে তাহা সাধারণতঃ ধরা যায় না।

Questions

1. What is combustion?
2. What is rust? Why does an iron utensil become heavy on rusting?
3. What happens when a candle burns?
4. How would you prove that the products of combustion of a candle are heavier than the candle itself?

তৃতীয় অধ্যায়

বায়ু

বায়ুর উপাদান

বায়ু মিশ্র পদার্থ (Air is a mechanical mixture)—বায়ু যৌগিকপদার্থ নহে, বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ মাত্র। ইহার উপাদানগুলিকে অনায়াসে পৃথক্ করা যায়। বায়ুর মধ্যে আয়তনে নাইট্রোজেন ৪ ভাগ ও অক্সিজেন ১ ভাগ থাকে। রাসায়নিক মিলনে প্রায়ই তাপের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই হিসাবে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিশাইলে উহার তাপ বা আয়তনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। উপরোক্ত কৃত্রিম বায়ু ও সাধারণ বায়ুর ধর্ম্ম এক; বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। বায়ুর উপাদানগুলি যে পরিমাণে ইহার মধ্যে মিশ্রিত রহিয়াছে, তাহা মোটামুটি স্থির থাকিলেও একেবারে নির্দ্দিষ্ট নয়। রাসায়নিক যোগ ঘটিলে উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত সর্ব্বসময়ে এক থাকিত। কিন্তু বায়ুতে উপাদানগুলির অনুপাত সকল স্থানে ও সর্ব্বসময়ে এক নয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, অবস্থাভেদে পরিমাণের সামান্য প্রভেদ হইয়াই থাকে। যৌগিকপদার্থে তাহা কখনও হইতে পারে না।

বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত—

অক্সিজেন	শতকরা	২০.৬০	ভাগ
নাইট্রোজেন	"	৭৭.১৬	"
জলীয় বাষ্প	"	১.৪০	"
কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড	"	০.০৪	"
আর্গন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য বায়বীয় পদার্থ	"	০.৮০	"
	মোট	১০০.০০	"

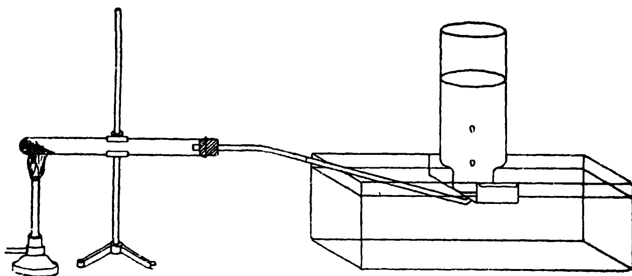
ইহা ছাড়া বায়ুতে অতি সামান্য নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্পও আছে, এবং অতি সূক্ষ্ম বহু ধূলিকণা সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অক্সিজেন

অক্সিজেনের স্বাভাবিক উৎপত্তি—বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন।

অক্সিজেন প্রস্তুত-করণ—যে সকল যৌগিক পদার্থে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন আছে, তাহা হইতে সাধারণতঃ অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাগারে অক্সিজেন প্রস্তুত-করণ—পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ পটাসিয়ম ক্লোরেট গরম করিয়া অক্সিজেন



৫৭। পটাসিয়ম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন প্রস্তুত-করণ

প্রস্তুত করা হয়। পটাসিয়ম ক্লোরেটের সহিত একটু ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন আরও সহজে বাহির হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ একটি পরীক্ষানলে (test tube) লইয়া উহার মুখে একটি কর্ক পরাও, ও সেই কর্কে ছিদ্র করিয়া একটি বাঁকা নল প্রবেশ করাইয়া দাও। এখন নলের অপর দিকটি একটি

পাত্রে জল রাখিয়া উহাতে ডুবাও। তারপর স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন দীপ জ্বালিয়া পরীক্ষানলটি উত্তপ্ত করিলে দেখিবে জলের মধ্য দিয়া অক্সিজেন গ্যাস বুদ্‌বুদ আকারে বাহির হইতেছে। যেখানে বুদ্‌বুদ উঠিতেছে ঐ স্থানে একটি জলপূর্ণ বোতল উপুড় করিয়া ধর। দেখিবে বোতলের মধ্যে গ্যাস জমিবে ও বোতলের জল বাহির হইয়া আসিবে। এখন গ্যাসপূর্ণ বোতলটির মুখ ঢাকনি দিয়া বন্ধ করিয়া সোজাভাবে বসাও।

পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের উপর ফোঁটা ফোঁটা হাইড্রোজেন পারক্সাইড ঢালিয়াও অক্সিজেন প্রস্তুত করা যায়।

অক্সিজেনের স্বরূপ—অক্সিজেন বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ, বায়বীয় পদার্থ। ইহা দহনীয় নহে, কিন্তু সকল দহনক্রিয়াই ইহার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। দহনের অর্থই অক্সিজেন-সংযোগ। অক্সিজেন ছাড়া কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না।

এই গ্যাস অতি সহজেই অপর মৌলিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়। হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিলিত হইলে জল হয়, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই পড়িয়াছ। অক্সিজেন জলে সামান্য দ্রবণীয় এবং বায়ু হইতে ভারী।

অক্সিজেনের পরীক্ষা—একটি জ্বলন্ত কাঠি নিভাইয়া অগ্নিকণা থাকিতে থাকিতে অক্সিজেন গ্যাস পূর্ণ জারের (jar) মুখে ঢুকাইয়া দাও, দেখিবে কাঠিটি আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

জীবজগতে অক্সিজেনের আবশ্যকতা—জীবমাত্রেরই অক্সিজেন আবশ্যক। এমন কি, জলের মাছও অক্সিজেন না হইলে বাঁচিবে না। প্রকৃতির ব্যবস্থা এই যে বায়ু কিয়ৎ পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হইতে পারে। কিন্তু নাইট্রোজেন অপেক্ষা অক্সিজেন

অধিক দ্রবণীয় হওয়ার দরুণ জলে দ্রবীভূত বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা বেশী। ইহাতে মাছের শ্বাসগ্রহণের সুবিধাই হয়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীরা শ্বাসকার্য্যে অক্সিজেন লয় ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। ইহা ছাড়া উদ্ভিদেরা আবার কার্ব্বন-আত্মকরণ ক্রিয়ার জন্য কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের কার্ব্বন লইয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে অক্সিজেন কবে ফুরাইয়া যাইত ও আকাশমণ্ডল কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্পে ভরিয়া যাইত! জীবজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইত।

অক্সিজেনের ব্যবহার—কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনার জন্য, অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখা আলোর জন্য তথা নানা ধাতু গলাইবার জন্য, প্রভৃতি নানারূপে ইহার ব্যবহার আছে। তবে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবার দরুণ এখন অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখার ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

Questions

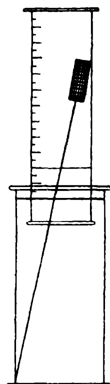
1. How does oxygen occur in nature?
2. How would you prepare oxygen in the laboratory? What experiments would you perform to demonstrate its properties?

নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেনের স্বাভাবিক উৎপত্তি—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে।

পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন প্রস্তুত-করণ—পরীক্ষাগারে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিতে হইলে উহা

ফস্‌ফরসের মৃদুদহনের সাহায্যে সহজে হইতে পারে। এক টুকরা ফস্‌ফরস ঈষৎ ভিজাইয়া সমভাগে দাগকাটা জারের (jar) ভিতর জলের উপর আবদ্ধ বায়ুতে রাখিয়া দিলে দেখিবে যে, জারের মধ্যে ধীরে ধীরে জল উঠিয়া উহার এক-পঞ্চমাংশ ভরিয়া ফেলিবে এবং বায়ুর অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক সংযোগের দরুণ ফস্‌ফরসের চেহারাও বদলাইয়া যাইবে। যে চারি-পঞ্চমাংশ বায়বীয় পদার্থ অবশিষ্ট রহিল তাহা মূলতঃ নাইট্রোজেন।



৫৮। নাইট্রোজেন প্রস্তুত-করণ

নাইট্রোজেনের স্বরূপ—নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, বায়বীয় পদার্থ। ইহা বিষাক্ত নহে। নাইট্রোজেন মূলতঃ নিষ্ক্রিয় পদার্থ; সহজে অন্য কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহে না। তবে ম্যাগ্‌নেসিয়ম আদি গুটিকয়েক মৌলিক পদার্থ আছে, যাহারা অতিশয় উত্তপ্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন টানিয়া লইয়া যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা জলে সামান্য দ্রবণীয় এবং বায়ু হইতে সামান্য হালকা।

অত্যধিক চাপ ও শৈত্য প্রয়োগে বায়ু তরলীভূত করা যায়। এই তরলীভূত বায়ুকে সাবধানে উবিয়া যাইতে দিলে প্রথমে যে গ্যাস বাহির হয় তাহার প্রায় সবটাই নাইট্রোজেন। ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন এই প্রক্রিয়া দ্বারাই প্রস্তুত হয়।

নাইট্রোজেনের পরীক্ষা—ইহা জলন্ত দীপশিখাকে নিভাইবে, কিন্তু ইহা চূণের জল ঘোলা করিবে না।

জীবের জন্য বায়ুতে নাইট্রোজেনের আবশ্যকতা—বাতাসের নাইট্রোজেন জীবের দেহগঠনে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোন সহায়তা করে না, তবে কিরূপে এই পদার্থটি জীবনযাত্রার উপযোগী? তোমরা জান যে, এমন সব তীব্র ঔষধ আছে যাহা জলে মিশাইয়া খাইতে হয়। জল না দিয়া শুধু সেই ঔষধ খাইতে চেষ্টা করিলে তোমার মুখ, গলা পুড়িয়া যাইবে। অক্সিজেনের ব্যাপারটা কতকটা সেইরূপ। ইহার দাহিকাশক্তি এত প্রবল যে, সুস্থ শরীরে ইহার শ্বাসগ্রহণ করিলে দেহের অশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য প্রকৃতিদেবী ইহাতে নাইট্রোজেন মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে ইহার তেজ কতকটা সংযত হয়। কিন্তু তোমরা দেখিয়াছ যে শ্বাসকষ্ট হইলে রোগী অনেক সময় অস্থির হইয়া পড়ে। তখন চিকিৎসকেরা বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখেন।

নাইট্রোজেনের ব্যবহার—বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসের কোনও ব্যবহার আমরা সচরাচর করি না। তবে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রোটিনের অঙ্গীভূত। জমিতে দিবার কোন কোন কৃত্রিম সার নাইট্রোজেন গ্যাস সাহায্যে প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাস ও নাইট্রিক এসিড ইহার সাহায্যে প্রস্তুত করা যায়।

Questions

1. How does nitrogen occur in nature? State its properties and uses.
2. How would you obtain nitrogen from air?
3. Is air a chemical compound? Give reasons for your answer.

ায় বাষ্প

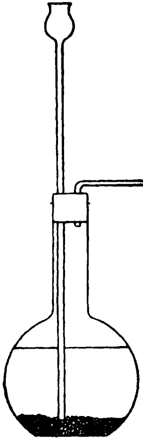
জলীয় বাষ্পের স্বাভাবিক উৎপত্তি—এক গেলাস বরফ-জল রাখিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ গেলাসের বাহিরের দিকে জল জমিতে আরম্ভ হইবে। একটু পরেই দেখিবে যে রীতিমত গেলাসের গা বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। গ্লাসের গায়ের জল কোথা হইতে আসিল? বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে তাহা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় জলে পরিণত হইয়াছে। বায়ুমণ্ডলের এই জলীয় বাষ্পই তোমরা শিশির-কুয়াসাদি রূপে দেখিতেছ। পৃথিবীতে সমুদ্র-নদী-হ্রদাদি যত জলাশয় আছে, তাহা হইতে জলীয় বাষ্প ক্রমাগত উপরে উঠিতেছে ও আকাশে ছড়াইয়া যাইতেছে। আবার সেই বাষ্পই শীতল হইয়া বৃষ্টি-তুষারাদি রূপে ভূমিতলে পড়িতেছে।

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড (বা অঙ্গারাম্ল বাষ্প)

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক উৎপত্তি—বায়ুতে সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়। জীবমাত্রেই শ্বাসত্যাগ কালে ইহা পরিত্যাগ করে। কাঠ, কয়লা ইত্যাদি পোড়াইলে যে গ্যাস নির্গত হয় তাহা প্রধানতঃ কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস। যে বাইকার্ব্বনেট অব সোডা ঔষধরূপে ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয়, তাহা উত্তপ্ত করিলে সহজেই এই গ্যাস বাহির হয়।

বায়ুতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্বের প্রমাণ—খানিকটা চূণের জল একটি কাচের বাটিতে কয়েকদিন রাখিয়া দিলেই দেখিবে যে, উপরে একটি সাদা সর পড়িয়াছে। এই সরটা চা-খড়ি,—চূণ ও অঙ্গারাম্ল বাষ্প (কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড) মিশিয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

পরীক্ষাগারে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত-করণ—পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ চা-খড়ি বা মার্ব্বেল পাথরের টুকরার উপর লবণাম্ল (hydrochloric acid) ঢালিয়া এই গ্যাস উৎপাদন করা হয়।



৫৯। চাখড়ি হইতে অঙ্গারাম্ল প্রস্তুত করিবার কাচকুপী

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের স্বরূপ—কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বর্ণহীন, কিন্তু ইহার ঈষৎ গন্ধ ও অম্লস্বাদ আছে। ইহা দাহ্য পদার্থ নহে, দহনেরও সাহায্য করে না। অব্যবহৃত কূপমধ্যে বা গুহাতে এই গ্যাস জমিয়া আছে কি না দেখিবার জন্য তাহাতে অগ্রে দীপশিখা নামাইয়া দেওয়া হয়। জ্বলন্ত দীপ ইহার মধ্যে ডুবাইলে নিভিয়া যায়। ইহা তরল পদার্থের মত একপাত্র হইতে অন্যপাত্রে ঢালা যায়। এই গ্যাস বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ ভারী এবং জলে দ্রবণীয়। চাপ দিয়া অনেকখানি গ্যাস জলের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে যে পদার্থ হয় তাহাই **বাতান্বিত জল** (aerated water) বা আমাদের পানীয় সোডা ওয়াটার। ম্যাগ্‌নেসিয়ম, সোডিয়ম ও পটাসিয়ম এই তিন ধাতু এই গ্যাসে জ্বলিতে পারে। ইহারা অঙ্গারাম্ল হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইয়া অঙ্গার ভাগকে মুক্ত করিয়া দেয়।

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের পরীক্ষা—একটি গেলাসে পরিষ্কার চূণের জল লইয়া তাহার মধ্যে কাচের নল দ্বারা ফুঁ দিতে থাক। দেখিবে, মুহূর্ত্তের মধ্যে চূণের জল ঘোলা হইয়া যাইবে ও ক্রমশঃ

একটি সাদা পদার্থ নীচে থিতিয়া পড়িবে। এই থিতিয়া পড়া পদার্থটি চা-খড়ি। আবার এই চা-খড়িকে ভাটিতে পোড়াইলে তাহা হইতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া যায়; যাহা পড়িয়া থাকে তাহা চূণ।



$$CaCO_3 = CaO + CO_2$$

চা-খড়ি　　চূণ　　কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার—ইহার প্রধান ব্যবহার সোডাওয়াটারের কারখানায় ও অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্রে। তোমরা থিয়েটার বায়স্কোপের বাড়ীতে লাল রঙের লোহার নল দেখিয়া থাকিবে। প্রয়োজন হইলে, ঐ নলের ভিতর প্রভূত অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হইবার ব্যবস্থা আছে। এই গ্যাসের সাহায্যে কাপড় কাচা সোডা প্রস্তুত করা যায়। ইহা জমিয়া কঠিন হইলে যে পদার্থ হয় তাহার নাম ড্রাই আইস্ (dry ice)। ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

Questions

1. How would you prove that air contains carbon dioxide and moisture?
2. How is carbon dioxide prepared in the laboratory? State its properties.
3. How would you demonstrate that the air we breathe out contains carbon dioxide?

চতুর্থ অধ্যায়

জল

জলের উপাদান

জল যৌগিক পদার্থ—পুরাকালে লোকে জলকে মৌলিক পদার্থ মনে করিত। এই ধারণা অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মনে ছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক **ক্যাভেণ্ডিশ** প্রথম প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি মৌলিক পদার্থ মিলিত হইয়া জল নামক যৌগিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে। জলে যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দুই মৌলিক পদার্থ আছে, তাহা সহজে পৃথক্ করা যায় না। মিশ্র পদার্থের উপাদানের পরিমাণ একেবারে নির্দ্দিষ্ট নহে, কিন্তু যৌগিক পদার্থের উপাদানের পরিমাণ একেবারে নির্দ্দিষ্ট। জলকে বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষণ (Electrolysis) করিলে উহা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়।

জলকে বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করণ—এমন একটি কাচের পাত্র লও যাহার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালন করিবার ব্যবস্থা আছে। বিজলী তারের দুই প্রান্তে দুইটি প্লাটিনাম পাত আটকাইয়া রাখ। পাত্রটিতে সামান্য সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশান পাতিত জল ঢাল। পরে, দুইটি দাগকাটা পরীক্ষানল জলে ভরিয়া লও ও ধীরে ধীরে সেই নল দুইটিকে পাত্রস্থ জলে এরূপ সাবধানে উল্টাইয়া দাও যে একটুও বায়ু না ঢোকে। প্লাটিনাম পাত দুইটির

এক একটি এক এক নলের নীচে থাকিবে। এইবার বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাও। দেখিবে যে নলদুইটির মধ্যে বুদ্‌বুদ উঠিতেছে ও নলমধ্যস্থ জল নামিয়া যাইতেছে। একটি নলে **অক্সিজেন** উঠিবে, অন্যটিতে **হাইড্রোজেন** উঠিবে। হাইড্রোজেনের আয়তন অক্সিজেনের দ্বিগুণ হইবে। একটি জ্বলন্ত কাঠি নিভাইয়া অগ্নিকণা থাকিতে থাকিতে অক্সিজেন গ্যাস রক্ষিত নলে ঢুকাইলে দপ্‌ করিয়া কাঠিটি জ্বলিয়া উঠিবে, কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস রক্ষিত নলে ঐরূপ হইবে না।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দ্বারা জল প্রস্তুত-করণ—জল বিশ্লেষণ করিলে যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায় তেমনি আবার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

জলের গুণ

বিশুদ্ধ জলের স্বরূপ—বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ, তরল পদার্থ। অল্প পরিমাণ জল লইলে তাহা বর্ণহীন বোধ হয়। বিশাল সমুদ্র কিন্তু ঈষৎ নীলাভ। ১০০° সেন্টিগ্রেডে জল ফুটিয়া বাষ্প হইতে থাকে, ও ০° সেন্টিগ্রেডে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। সাধারণ উত্তাপে সোডিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া হাইড্রোজেন বাহির করিয়া দেয়। লৌহ, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি ধাতু কেবল উত্তপ্ত অবস্থায় এই বিশ্লেষণকার্য্য করিতে পারে। সকল অবস্থাতেই জল একটু একটু করিয়া বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে। ফুটাইলে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর সম্পন্ন হয়। জলে চিনি বা নিশাদল গলাইলে জল ঠাণ্ডা হয়, ইহা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ। তেমনই চূণ জাতীয় পদার্থ জলে দিলে, জল কিছু গরম হইয়া উঠে। ইহাও

তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, জলে স্পিরিট দিলে উহা গলিয়া যায় ও উত্তাপ ঈষৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কোন তরল পদার্থ জল কিনা তাহার পরীক্ষা—(১) উহার স্ফুটনাঙ্ক ১০০° এবং হিমাঙ্ক ০° হইবে।

(২) তুঁতে গরম করিলে উহার নীল রং নষ্ট হইয়া সাদা হইয়া যাইবে। এই সাদা তুঁতেতে তুই এক ফোঁটা জল দিলে উহার নীল রং ফিরিয়া আসিবে।

(৩) পাথুরে চূণে জল দিলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, এবং পাথুরে চূণের ডেলাগুলি ক্রমশঃ গুঁড়া হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।

(৪) জলে এক কণিকা পটাশিয়ম ধাতু ফেলিয়া দিলে বেগনি আলোকশিখা দেখা দিবে।

প্রাকৃতিক জল

প্রাকৃতিক জলের প্রকারভেদ—পৃথিবীতে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ বেশী। জলের গুণানুসারে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যথা—নোনা জল, মিঠা জল, মৃদু জল, খর জল ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক জলের স্বরূপ—জলে অনেক পদার্থই অতি সহজে দ্রবণীয়। এই জন্য রাসায়নিক হিসাবে বিশুদ্ধ জল প্রকৃতিতে কখনই পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক জলের মধ্যে বৃষ্টির জল এবং শিলা বা তুষার গলান জল অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। কিন্তু পাতিত (distilled) জল ছাড়া আর কোন জলই একেবারে বিশুদ্ধ নহে। জলে যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত থাকে তাহাদের জন্য স্বাভাবিক জলের গুণের স্বল্লাধিক ব্যতিক্রম হইতে বাধ্য।

প্রাকৃতিক জলকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) **বৃষ্টির জল**—ইহাই প্রাকৃতিক বিশুদ্ধ জল। কিন্তু ইহাতেও কিছু অক্সিজেন ও অঙ্গারাম্ল থাকে, সামান্য নাইট্রিক অ্যাসিডেরও চিহ্ন পাওয়া যায়। (২) **কূপ বা ঝরণার জল**—প্রশস্ত পানীয় জল। ইহাতে নানা ধাতুঘটিত লবণ বিদ্যমান। সোডিয়ম, পটাশিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগ্নেসিয়ম ঘটিত লবণ থাকেই, কখন কখন লৌহঘটিত লবণও পাওয়া যায়। (৩) **নদী, খাল, বিলের জল**—ইহাতে নানা প্রকার অশুদ্ধ দ্রব্যাদি থাকিতে পারে। না ছাঁকিয়া ও ফিলটার না করিয়া পান করা উচিত নহে। (৪) **সমুদ্রের জল**—অতিশয় লবণাক্ত ও অপেয়। নানাপ্রকার ধাতব লবণ এই জলে পাওয়া যায়।

উপকারী লবণাক্ত জল—তোমরা শুনিয়া থাকিবে যে অনেক কূপ বা ঝরণার জলের ঔষধ বলিয়া খ্যাতি আছে। ইহার অর্থ এই যে, সেই জলে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী নানারূপ লবণ দ্রবীভূত থাকে। আমাদের দেশে মুঙ্গেরের **সীতাকুণ্ডের জল** ও ইউরোপে **ভিশি** (Vichy), **কার্লসবাড** (Carlsbad) ইত্যাদির জল এইরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

প্রাকৃতিক জল পরিষ্কৃত করণ—সাধারণতঃ নদী, খাল বিলের জল ফটকিরি দিয়া পরিষ্কৃত করা হয়। ফটকিরিযুক্ত জল কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে তাহার মধ্যস্থ কাদা ইত্যাদি নীচে থিতাইয়া পড়ে। তখন উপরের পরিষ্কার জল পাত্রান্তরে ঢালিয়া লইতে হয়। জলের মধ্যে নানারূপ রোগবীজাণু থাকিতে পারে। উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে এই সমস্ত বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি পাতিত জলই একমাত্র বিশুদ্ধ; কিন্তু

তোমরা একবার এই জল খাইয়া দেখিলে বুঝিবে যে ইহা কিরূপ বিস্বাদ! ইহার অর্থ এই যে, মানবের অপকারী নয় এরূপ অনেক লবণ জলে থাকে, সামান্য বায়ুও জলে দ্রব অবস্থায় থাকে। এইগুলি থাকে বলিয়াই আমরা যাহাকে সুপেয় ও সুমিষ্ট জল বলি তাহা সুস্বাদ হয়।

মৃদু ও খর জল—তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, সকল জলে সাবানের ফেনা সমান হয় না। যে জলে সহজেই ফেনা হয়, তাহাকে বলা হয় **মৃদু জল**; যাহাতে হয় না, তাহাকে বলা হয় **খর জল**। এই দ্বিতীয় প্রকার জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

মৃদুতা ও খরতার রাসায়নিক কারণ—পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জলে যদি ম্যাগ্‌নেসিয়ম বা ক্যালসিয়ম ঘটিত লবণ থাকে তাহা হইলে সেই জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় না। জলের এই খরতা-গুণ স্থায়ীও হইতে পারে, অস্থায়ীও হইতে পারে। যদি উপরোক্ত দুই ধাতুর বাই-কার্ব্বনেট লবণ জলে গোলা থাকে, তবে সে জলকে সহজেই মৃদু করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু যদি উক্ত ধাতুদ্বয়ের ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ জলে দ্রবীভূত থাকে, তবে সে জলের খরতা দূর করা বড়ই কঠিন।

খরজলকে মৃদু করিবার উপায়—(১) জল ফুটাইয়া বা উপযুক্ত পরিমাণ চূণের জল মিশাইয়া উহাকে উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া লইলে দেখিতে পাইবে যে একটা গুঁড়া পদার্থ নীচে থিতাইয়া পড়িয়াছে। এখন ছাঁকিয়া লইলেই দেখিবে জল বেশ মৃদু হইয়াছে। খরতা স্থায়ী হইলে সোডা মিশাইয়া ফুটাইয়া লইলে সেই জল মৃদু হইয়া যায়।

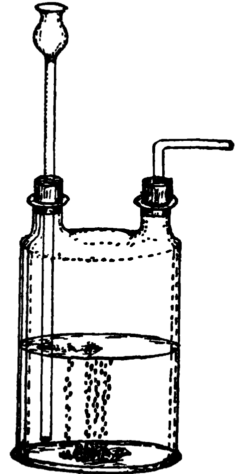
(২) বর্ত্তমান কালে আরও সহজ বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পারমুটাইট্‌ নামক এক পদার্থের মধ্য দিয়া জলকে ফিল্‌টার করিয়া লইলে খরজল মৃদু হইয়া যায়।

অক্সিজেন

ইহার সম্বন্ধে বায়ুর উপাদান বলিবার সময় প্রায় সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে।

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন প্রস্তুত-করণ—তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলীয় বাষ্পকে উত্তপ্ত লোহার উপর দিয়া চালাইলে লোহা জলের অক্সিজেন টানিয়া লয় ও হাইড্রোজেন বাহির হয়। জলে সোডিয়ম, পটাশিয়ম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর যে কোন একটি ফেলিয়া দিলেও জল হইতে হাইড্রোজেন নির্গত হয়।



৬০। উল্ফ্-বোতল

পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুত-করণ—পরীক্ষাগারে সচরাচর দস্তার টুকরার উপর সাল্ফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয়। যে পাত্রে এই পরীক্ষা হয় তাহা একটি দুই-মুখবিশিষ্ট বোতল, নাম উল্ফ্-বোতল (চিত্র ৬০)। দুই মুখে ছিপি আঁটিয়া ছিপি দুইটির মধ্যে দুইটি নল পরান হয়। একটি নলের আগায় একটি ছোট ফানেল থাকে। সে নলটি একেবারে বোতলের তলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয় নলটি আরম্ভ হইয়াছে বোতলের গলার নিকট হইতে এবং তাহার আগা খুব সরু। এই বোতলে প্রথমে

দস্তার টুকরা রাখিয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে ফানেল দিয়া অ্যাসিড ঢালিতে থাক। বেগে বুদ্‌বুদ উঠিবে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হইতে থাকিবে। ভিতরের সমস্ত বাতাস বাহির হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত একটু অপেক্ষা কর। তারপরে একটি দেশলাই জ্বালাইয়া দ্বিতীয় নলের স্থচাল মুখে ধরাও, দেখিবে দিব্য নীলাভ দীপশিখা। ইহাই জ্বলন্ত হাইড্রোজেনের শিখা। শিখার একটু উপরে ঠাণ্ডা জলভরা একটি বাটি ধর, বাটিটির গায়ে জলবিন্দু দেখা দিবে। বুঝিবে হাইড্রোজেন জ্বলিয়া জল উৎপন্ন হইতেছে

ব্যবসায়ের জন্য হাইড্রোজেন প্রস্তুত করণ—ব্যবসায়ে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয় উত্তপ্ত লোহাচুরের উপর জলীয় বাষ্পের ক্রিয়া দ্বারা।

হাইড্রোজেনের স্বরূপ—হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ গ্যাস। জলে ইহা অতি সামান্য দ্রবণীয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হালকা পদার্থ। অক্সিজেনের প্রতি ইহার বিশেষ আসক্তি আছে বলিয়া যৌগিক পদার্থের মধ্য হইতে অতি সহজে অক্সিজেন টানিয়া লইতে পারে।

একটি রবারের বেলুন হাইড্রোজেন পূর্ণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে দেখিবে যে উহা ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ, হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা অনেক হাল্কা।

হাইড্রোজেনের পরীক্ষা—অক্সিজেন বা বায়ুতে ইহা জ্বলিতে পারে ও সেই শিখা নীলাভ। দহনের ফলে জল উৎপন্ন হয়। ইহা পরিষ্কার চূণের জলকে ঘোলা করিতে পারে না।

হাইড্রোজেনের ব্যবহার—বেলুন, উড়োজাহাজ, ও ভেজিটেবল ঘৃত ইত্যাদিতে প্রচুর হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়।

বায়ু ও জলের তুলনা :

বায়ু	জল
১। গ্যাস জাতীয়।	১। তরল।
২। মিশ্র পদার্থ।	২। যৌগিক পদার্থ।
৩। উপাদান (ক) অক্সিজেন। (খ) নাইট্রোজেন। (গ) জলীয় বাষ্প। (ঘ) কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড। (ঙ) অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পদার্থ।	৩। উপাদান (ক) অক্সিজেন। (খ) হাইড্রোজেন।
৪। উপাদানের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নয়।	৪। উপাদানের পরিমাণ একেবারে নির্দ্দিষ্ট, দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন থাকে।
৫। উপাদান অনায়াসে পৃথক্ করা যায়।	৫। উপাদানগুলি পৃথক্ করিতে হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক।
৬। জীবের অত্যাবশ্যক পদার্থ অক্সিজেন ইহা হইতেই আসে।	৬। জীবের অত্যাবশ্যক পদার্থ।

Questions

1. How would you prove that water is composed of Hydrogen and Oxygen?
2. What is hard water? How can you soften it?
3. How is Hydrogen prepared in the laboratory? State its properties and uses.
4. Show that air is a mechanical mixture and water is a chemical compound.

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড, ও হাইড্রোজেন গ্যাসের তুলনা :

	অক্সিজেন	নাইট্রোজেন	কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড	হাইড্রোজেন
১। স্বাভাবিক উৎপত্তি—	বায়ুতে $\frac{1}{5}$ অংশ।	বায়ুতে $\frac{4}{5}$ অংশ।	বায়ুতে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।	বায়ুতে নাই।
২। প্রস্তুতকরণ—	পটাশিয়ম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে পাওয়া যায়।	অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট উত্তপ্ত করিলে পাওয়া যায়।	মার্ব্বেল পাথরের টুকরার উপর হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিলে পাওয়া যায়।	দস্তার টুকরায় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিলে পাওয়া যায়।
৩। স্বরূপ—				
(ক) বর্ণ	বর্ণহীন।	বর্ণহীন।	বর্ণহীন।	বর্ণহীন।
(খ) স্বাদ	স্বাদহীন।	স্বাদহীন।	ঈষৎ অম্লস্বাদযুক্ত।	স্বাদহীন।
(গ) গন্ধ	গন্ধহীন।	গন্ধহীন।	মৃদু গন্ধযুক্ত।	গন্ধহীন।
(ঘ) জলে দ্রবণীয় কিনা	সামান্য দ্রবণীয়।	সামান্য দ্রবণীয়।	দ্রবণীয়।	সামান্য দ্রবণীয়।
(ঙ) বায়ুর তুলনায় ভার	বায়ু হইতে ভারী।	বায়ু হইতে লঘু।	বায়ু হইতে বেশ ভারী।	সর্ব্বপ্রকার গ্যাস অপেক্ষা হালকা।
(চ) দহনে সাহায্য করে বা নিজে দাহ্য কিনা	সকল দহন কার্য্যে সাহায্য করে। কিন্তু নিজে দাহ্য নহে।	দহন কার্য্যের সহায়ক নহে বা নিজে দাহ্য পদার্থ নহে।	দহন কার্য্যের সহায়ক নহে বা নিজে দাহ্য পদার্থ নহে।	ইহা দাহ্য গ্যাস।
(ছ) শ্বাসকার্য্যের সহায়ক কি না।	শ্বাসকার্য্যের সহায়ক।	শ্বাস কার্য্যের গৌণ সহায়ক।	শ্বাসকার্য্যের সহায়ক নহে।	শ্বাসকার্য্যের সহায়ক নহে।
৪। পরীক্ষা				
(ক) জ্বলন্ত কাঠি সংস্পর্শের পরিণতি।	দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।	একেবারে নিভিয়া যায়।	একেবারে নিভিয়া যায়।	নিজেই জ্বলিয়া উঠে।
(খ) পরিষ্কার চুণের জলের সংস্পর্শের পরিণতি।	কোনও ক্রিয়া নাই।	কোনও ক্রিয়া নাই।	দুধের মত সাদা করে।	কোনও ক্রিয়া নাই।
৫। ব্যবহার	কৃত্রিম শ্বাস পরিচালনার সহায়ক। অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখায় নানা ধাতু গলান হয়।	ইহার সাহায্যে এমোনিয়া, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়।	সোডাওয়াটারে ও অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্রে ব্যবহার হয়। জমিয়া ড্রাই আইস হয়।	বেলুন, এরোপ্লেন, ভেজিটেবল ঘৃত প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

যাহা পৃথিবীকে টানিয়া রাখিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে—তাহা কত বড় এবং তাহার আলোক ও উত্তাপ কত বেশী !

সূর্য্যের আয়তন—পণ্ডিতেরা সূর্য্যের আয়তন, ওজন, উত্তাপ প্রভৃতি মাপিতে পারিয়াছেন। সূর্য্যের ব্যাস (diameter) ৮৬৬৫০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ এবং সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ।

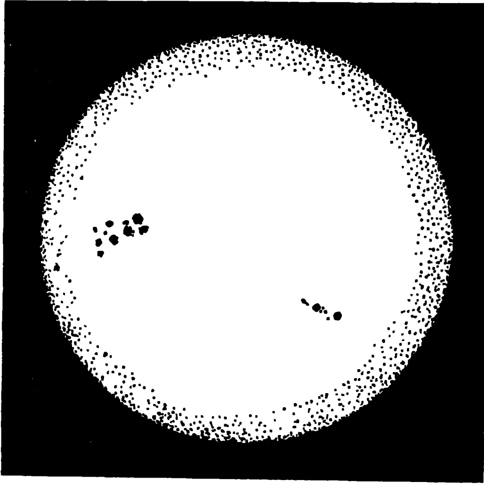
সূর্য্যের ওজন ও ঘনত্ব—সূর্য্যের ওজন পৃথিবীর ৩৩৩০০০ গুণ। পৃথিবীর ওজন প্রায় $১\cdot৮\times১০^{২৩}$ মণ। তাহা হইলে সূর্য্যের ওজন হইতেছে প্রায় ৬×১০^{২৮} মণ। কিন্তু এত ভারী হইলেও সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত নয় বলিয়া ইহার ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের প্রায় চারি ভাগের এক ভাগ।

সৌরমণ্ডল—সূর্য্যের তিনটি বিভিন্নমণ্ডল—(১) আলোকমণ্ডল, (২) বর্ণমণ্ডল, ও (৩) ছটামণ্ডল।

(১) **আলোকমণ্ডল**—দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যকে বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়। সাধারণতঃ সৌরমণ্ডলের উপরকার আবরণটিই চোখে পড়ে। এই আবরণটির নাম আলোকমণ্ডল (photosphere)। দূরবীনে আলোকমণ্ডলের সকল অংশ সমান উজ্জ্বল দেখা যায় না। স্পষ্টই দেখা যায় যে মাঝখান অপেক্ষা ধারের দিকের উজ্জ্বলতা অনেক কম।

সূর্য্য এত উজ্জ্বল হইলেও, ভাল করিয়া দেখিলে ইহাতে কতকগুলি কাল বিন্দু দেখা যায়। এই কাল বিন্দুগুলি সকল সময় একরূপ অবস্থায় থাকে না। ইহাদের আকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। এ গুলিকে **সৌর কলঙ্ক** (sun-spot) বলে। কলঙ্কগুলির মধ্যভাগ ঘোর কাল, কিন্তু চারিধার অপেক্ষাকৃত কম কাল। কোন কোনটির আকার

এত বড় যে তাহাদের ভিতর আমাদের পৃথিবী অনায়াসে ঢুকিয়া যাইতে পারে। কলঙ্কগুলি সকল সময় সমানভাবে দেখা যায় না।



৬১। সৌর কলঙ্ক

এগার বৎসর পর পর এগুলির সংখ্যা অত্যন্ত বাড়ে। ১৯০৬, ১৯১৭ এবং ১৯২৮ সালে ইহাদের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। আশা করা যায়, পুনরায় ১৯৩৯ সালেও ইহাদের সংখ্যা খুব বাড়িবে।

দূরবীক্ষণ (telescope) যন্ত্রে কাল কাচ লাগাইয়া এগুলি দেখিতে হয়। বড় বড় কলঙ্কগুলি অনেক সময় কাল কাচের ভিতর দিয়া খালি চোখেও দেখা যায়। এই কলঙ্কগুলি ভাল করিয়া কয়েকদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও তাহার অক্ষের চারি দিকে ঘোরে। কলঙ্কগুলিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় সাতাশ

দিনে একবার ঘুরিয়া আসিতে দেখা যায়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, সূর্য্যও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সাতাশ দিনে একবার ঘুরিয়া আসে।

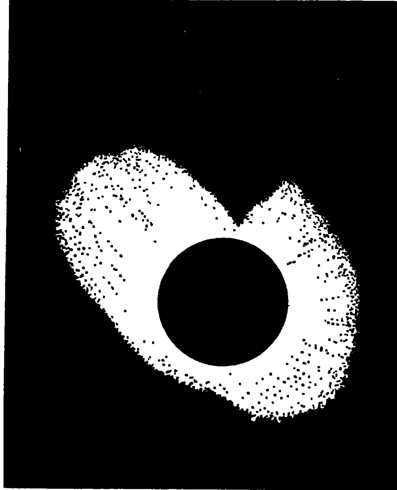
এই কলঙ্কগুলি কি এবং কেন ওগুলি ঐরূপ দেখা যায়? পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অত্যধিক উত্তাপের জন্য সূর্য্যের বাহিরের আবরণ ফুটন্ত জলের ন্যায় সর্ব্বদা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। কলঙ্কগুলি এক একটি গর্ত্ত, উহাদের ভিতর হইতে উত্তপ্ত বাষ্প বেগের সহিত বাহির হইয়া আসিতেছে। ফুটন্ত জলের ভিতর হইতে যেরূপ বুদ্বুদ বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়, সূর্য্যের ভিতর হইতেও ঐরূপ উত্তপ্ত বাতাসের বুদ্বুদ বাহির হয়। বাহিরে আসিলে, ঐরূপ বুদ্বুদগুলির উত্তাপ কমিয়া যায়। এই কারণে সূর্য্যের ঐ সকল স্থানের উত্তাপ পার্শ্ববর্ত্তী অংশের চেয়ে কম এবং সেই জন্য ঐস্থানগুলি কাল দেখায়।

যে বাষ্প সূর্য্য হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহা আকাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়। পৃথিবীর বৃহৎ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইহার তুলনায় কিছুই নয়। সূর্য্যের অগ্ন্যুৎপাত অনেক সময় সৌরমণ্ডল হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল উপরে ছিটকাইয়া পড়ে।

(২) **বর্ণ-মণ্ডল**—পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্য্যকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিলে কাল চাঁদটিকে ঘিরিয়া লাল রঙের একটি বৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বর্ণমণ্ডল (chromosphere) বলে। সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে বাষ্প অনবরত জ্বলিতেছে, বর্ণ-বণ্ডল সেই আগুনের শিখা। এক একটি শিখা হাজার হাজার মাইল উচ্চ হয়। কোন কোন সময় দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ মাইল উচ্চ শিখাও দেখিতে পাওয়া যায়।

নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৌরমণ্ডলের অনেক কিছু জানা গিয়াছে। সূর্য্যের আলোক প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া আসিলে ঐ আলোকে নানাপ্রকার রং দেখা যায়। ঐরূপ প্রিজ্‌মের একটি যন্ত্র

তৈয়ারী হয়। তাহার নাম **বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্র** (spectroscope)। ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলোক দেখিলে নানা রঙের বর্ণচ্ছত্রের মাঝে মাঝে কতকগুলি কাল রেখা দেখা যায়। ঐ রেখাগুলি হইতে



৬২। ছটা-মণ্ডল

বৈজ্ঞানিকগণ সৌরমণ্ডলের অনেক কিছু খবর পান। বর্ণ-মণ্ডলে কি কি বাষ্প জ্বলিতেছে, তাহা কিরূপ অবস্থায় আছে, প্রভৃতি অনেক কিছুই অতি সহজে জানা যায়।

(৩) **ছটা-মণ্ডল**—সূর্য্যগ্রহণের সময় বর্ণ-মণ্ডলকে ঘিরিয়া তীব্র আলোকের ছটা বাহির হইতে দেখা যায়। ইহাকে ছটা-মণ্ডল (corona) বলে। উত্তপ্ত বাষ্প হইতেই এই আলোক বাহির হয়। ছটা-মণ্ডল দেখিলে সূর্য্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ণ গ্রহণের সময় ছাড়া বর্ণ-মণ্ডল ও ছটা-মণ্ডল দেখা যায় না। এক একটি সূর্য্যগ্রহণের সময় দেশ বিদেশের পণ্ডিতগণ বহুমূল্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। ঐ সকল আলোক-চিত্র হইতে পরে সৌরমণ্ডলের উপাদান, উষ্ণতা প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই অনেক কিছু জানিতে পারা যায়।

Questions

1. What are the dimensions of the Sun? What is the distance between the earth and the Sun?
2. What do you know about sun-spots? Give a short account of the photosphere, chromosphere and corona of the Sun?

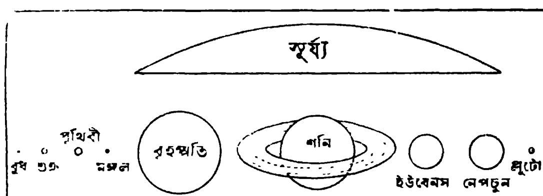
দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রহ-উপগ্রহ

সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে কয়টি বস্তু অনবরত ঘুরিতেছে তাহাদিগকে গ্রহ (planet) বলে। সূর্য্যের আকর্ষণের জন্যই ইহারা ঘোরে। পৃথিবী এইরূপ একটি গ্রহ। কোন কোন গ্রহের চারিদিকে আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তু ঘোরে। ইহারা উপগ্রহ। চাঁদ আমাদের পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

গ্রহগণের নাম—সর্ব্বসমেত নয়টি গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে ;—বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনস্ (Uranus), নেপচুন (Neptune) এবং প্লুটো (Pluto)।

ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ছয়টির কথা বহু পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, শেষ তিনটির কথা পরে জানা গিয়াছে। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত পণ্ডিত হার্শেল ইউরেনস্ আবিষ্কার করেন, এবং তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে নেপচুনের কথা জানা যায়। গত ১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কৃত হইয়াছে।



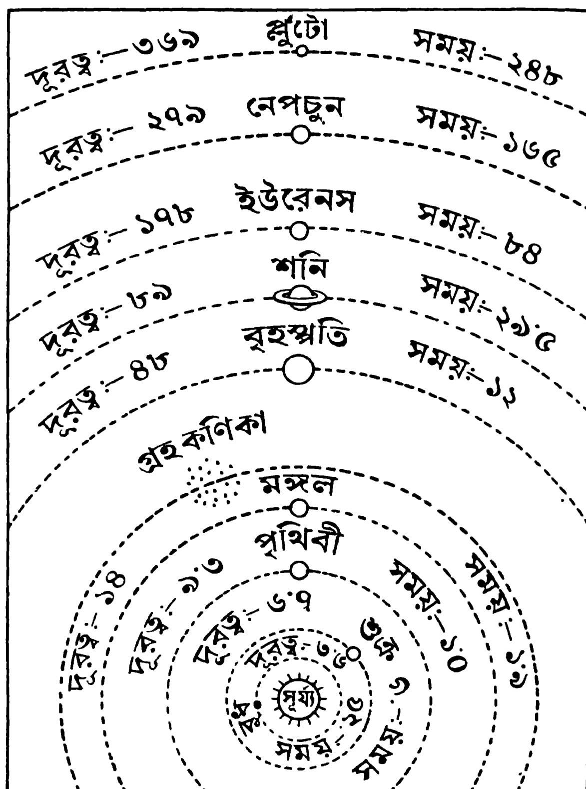
৬৩। সূর্য্যের সহিত গ্রহগণের আয়তনের তুলনা

গ্রহগণের আয়তন—উপরের চিত্র হইতে গ্রহগণের আয়তনের কিরূপ তারতম্য আছে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহারা সূর্য্যের অতি নিকটে অথবা বেশী দূরে আছে তাহারা বেশ ছোট, মাঝের কয়েকটি ইহাদের তুলনায় অনেক বড়। বৃহস্পতি সকলের চেয়ে বড়, ইহার ব্যাস প্রায় ৯০,০০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় ১১ গুণ। আয়তনে ইহা পৃথিবীর প্রায় ১৩০০ গুণ এবং ওজনে ৩১৭ গুণ। সকল গ্রহ একত্র করিলেও তাহাদের মোট ওজন বৃহস্পতির ওজনের অর্দ্ধেকও হয় না।

গ্রহগণের আপেক্ষিক দূরত্ব

সূর্য্য হইতে দূরত্ব ও বোডের নিয়ম—নয়টি গ্রহের দূরত্ব মোটামুটি একটি নিয়ম মানিয়া চলে। ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ ও ১৯২ এই কয়টি সংখ্যার প্রত্যেকের সহিত ৪ যোগ করিলে

৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২, ১০০ ও ১৯৬ হয়। সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্ব প্রায় ৪ কোটি মাইল। শুক্র প্রভৃতি গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্ব যথাক্রমে



৬৪। সৌর জগৎ

বুধের দূরত্বের $\frac{৭}{৪}$, $\frac{১০}{৪}$, $\frac{১৬}{৪}$, $\frac{২৮}{৪}$, $\frac{৫২}{৪}$, $\frac{১০০}{৪}$ এবং $\frac{১৯৬}{৪}$ গুণ। এই নিয়মটিকে **বোডের নিয়ম** (Bode's law) বলে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী

ও মঙ্গল এই চারিটি গ্রহের প্রকৃত দূরত্ব যথাক্রমে ৩৬০ লক্ষ, ৬৭২ লক্ষ, ৯২৮ লক্ষ এবং ১৪২০ লক্ষ মাইল। বৃহস্পতি, শনি এবং ইউরেনসের দূরত্ব যথাক্রমে ৪৮৩০ লক্ষ, ৮৮৬০ লক্ষ এবং ১৭৮২০ লক্ষ মাইল। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে প্রায় ১২০০ অতি ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। এইগুলিকে গ্রহকণিকা বা গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroids) বলে। সূর্য্য হইতে ইহাদের গড়পড়তা দূরত্ব প্রায় ২৬ কোটি মাইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে বুধ হইতে ইউরেনস পর্য্যন্ত সকল গ্রহই মোটামুটি বোডের নিয়ম মানিয়া চলে। কিন্তু সূর্য্য হইতে নেপচুন এবং প্লুটোর দূরত্ব এই নিয়মের ব্যতিক্রম। নেপচুনের দূরত্ব প্রায় ২৮০ কোটি মাইল এবং প্লুটোর দূরত্ব প্রায় ৩৭০ কোটি মাইল। এত দূর হইলেও তারকাগুলির দূরত্বের সহিত তুলনা করিলে এগুলি অত্যন্ত কম। নিকটতম তারকার পৃথিবী হইতে দূরত্ব প্লুটোর দূরত্বের সহস্রগুণের চেয়েও বেশী। দূরের তারকাগুলির দূরত্ব ইহার কোটি কোটি গুণ।

বিভিন্ন গ্রহের সূর্য্য পরিক্রমের সময়—নিকটের গ্রহগুলি অল্প সময়ে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে, দূরের গ্রহগুলির অনেক সময় লাগে। বুধ প্রায় তিন মাসে একবার ঘোরে, শুক্রের সাড়ে সাত মাস লাগে, পৃথিবীর এক বৎসর, মঙ্গলের এক বৎসর দশ মাস, বৃহস্পতির প্রায় বার বৎসর, শনির সাড়ে উনত্রিশ বৎসর, ইউরেনসের চুরাশী বৎসর, নেপচুনের ১৬৫ বৎসর এবং প্লুটোর ২৪৮ বৎসর লাগে। সূর্য্য হইতে প্রত্যেকটি গ্রহের দূরত্বের সহিত তাহার একবার ঘুরিয়া আসার সময়ের একটি সম্পর্ক আছে। **কেপলার** নামক একজন জার্ম্মাণ জ্যোতির্ব্বিদ্ এই সম্পর্ক বাহির করেন।

নয়টি গ্রহই একই দিকে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং কয়েকটি ছাড়া উপগ্রহগুলিরও গতি ঐ দিকেই। গ্রহগুলির উত্তাপের তারতম্য অত্যন্ত

বেশী হইলেও কোন গ্রহেরই নিজস্ব আলোক নাই। সকলেই সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক বিকিরণ করে।

বুধ—বুধ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাহার উত্তাপ অত্যন্ত বেশী। চন্দ্রের ন্যায় বুধেরও কলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। দূরবীনের সাহায্যে এই হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। বুধের কোন উপগ্রহ নাই। বুধ আয়তনে পৃথিবীর প্রায় ষোল ভাগের একভাগ এবং ইহার ভর (mass) মাত্র পৃথিবীর পঁচিশ ভাগের একভাগ। বুধের বায়বীয় আবরণ আছে কিনা জানা নাই।

শুক্র—নয়টি গ্রহের মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর নিকটতম, এবং সেই কারণেই ইহাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখা যায়। সন্ধ্যাকাশের "শুকতারা" আকাশের যে কোনও তারার চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। বুধের ন্যায় শুক্রেরও কলার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। শুক্রের উত্তাপ বুধ অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী। শুক্রের পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল আছে। শুক্রের কোন উপগ্রহ নাই। পৃথিবী হইতে শুক্রের দূরত্বের তারতম্য হয়, এবং সেই জন্য আয়তনেরও তারতম্য দেখা যায়। শুক্র ওজনে পৃথিবী অপেক্ষা কম হইলেও, আয়তনে প্রায় পৃথিবীর সমান।

পৃথিবী—শুক্রের পরবর্ত্তী গ্রহ আমাদের পৃথিবী। ইহার ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, এবং ওজন প্রায় $১\cdot৮ \times ১০^{২৩}$ মণ। পৃথিবী নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া এখানে জীবজন্তু, গাছপালার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

মঙ্গল—মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অপরদিকে আছে। মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, মাত্র ছয় ভাগের একভাগ, এবং ওজনে নয় ভাগের একভাগ। ইহার দুইটি উপগ্রহ আছে। মঙ্গল গ্রহের উত্তাপ পৃথিবী অপেক্ষা কম, সেখানে জীবজন্তু বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নয়।

দূরবীনের ভিতর দিয়া মঙ্গল গ্রহ দেখিলে, উহার উপর কতকগুলি কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ওগুলিকে মঙ্গল গ্রহের খাল বলেন। তাঁহারা বলেন ঐ গ্রহে মানুষের ন্যায় এক প্রকারের জীব বাস করে, তাহারাই ঐ খালগুলি কাটিয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় নাই।

বৃহস্পতি—মঙ্গল গ্রহের পরবর্ত্তী গ্রহ বৃহস্পতি। ইহা নয়টি গ্রহের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। বৃহস্পতি মঙ্গলের তুলনায় অনেক বেশী ঠাণ্ডা। ঐরূপ ঠাণ্ডায় কোনরূপ জীবজন্তু বাস করিতে পারে না। শুক্রের ন্যায় বৃহস্পতির চারিদিক ঘিরিয়া বায়ুমণ্ডলের আবরণ দেখা যায়। আমাদের একটিমাত্র চাঁদ আছে, বৃহস্পতির নয়টি চাঁদ দেখিতে পাওয়া যায়।

শনি—বৃহস্পতির পরের গ্রহটির নাম শনি। ইহা আয়তনে এবং ওজনে বৃহস্পতি অপেক্ষা ছোট, কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। শনি আয়তনে পৃথিবীর সাত শত গুণ এবং ওজনে প্রায় এক শত গুণ। শনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও ঠাণ্ডা। সেই জন্য সেখানে কোন জীবজন্তু থাকিতে পারে না। শনিরও নয়টি চাঁদ আছে। ইহার আর একটি বিশেষত্ব আছে। চাকার মত আকারে একটি উজ্জ্বল আবরণ শনির চারিদিকে ঘিরিয়া আছে।

ইউরেনস ও নেপচুন—ইহারা বৃহস্পতি অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহাদের আয়তন প্রায় সমান। ইউরেনস পৃথিবীর ৬৪ গুণ বড় এবং ওজনে প্রায় পনর গুণ। নেপচুন আয়তনে পৃথিবীর ৬০ গুণ এবং ওজনে প্রায় সতের গুণ। ইউরেনসের চারিটি চাঁদ এবং নেপচুনের একটি চাঁদ আছে। আমাদের ৮৪ বৎসরে ইউরেনসের এক বৎসর হয় এবং ১৬৫ বৎসরে, নেপচুনের একটি বৎসর।

প্লুটো—সংপ্রতি এই ছোট গ্রহটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে প্লুটো। সূর্য্য হইতে উহার দূরত্ব ইউরেনসের দূরত্বের প্রায় দুইগুণ। উহার আয়তন এবং ওজন সঠিকভাবে জানা যায় নাই। তবে জানা গিয়াছে যে, ইহা একটি ছোট গ্রহ।

সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহগুলি অত্যন্ত গরম, আবার দূরের গুলি বেশী ঠাণ্ডা। অতিরিক্ত গরম এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, কিছুই জীবজগতের পক্ষে ভাল নয়; সেই জন্য বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহে জীবজন্তু বাস করিতে পারে না। শুক্র পৃথিবী হইতে বেশী গরম হইলেও সেখানে জীবজন্তুর বাস একেবারে অসম্ভব নয়, এবং মঙ্গলের উত্তাপ পৃথিবী অপেক্ষা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে জীবজন্তুর বাস সম্ভব।

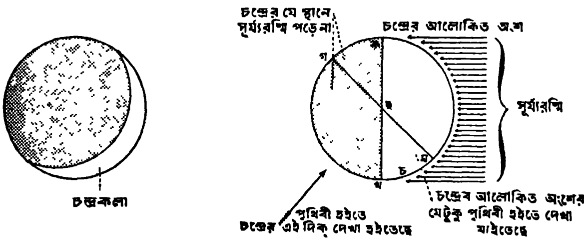
চন্দ্র

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চন্দ্র পৃথিবীর **উপগ্রহ** (satellite)। চন্দ্র সূর্য্যের মত জ্বলন্ত গোলক নহে। ইহা গোলাকার, কঠিন ও ঠাণ্ডা। সূর্য্য হইতে ইহা অত্যন্ত ছোট।

চন্দ্রের দূরত্ব—আকাশের সমস্ত বস্তুর মধ্যে চাঁদই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবী হইতে চাঁদের দূরত্ব প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল, আর্থাৎ দ্রুতগামী এরোপ্লেনে চড়িয়া চাঁদে পৌছিতে প্রায় দুইমাস সময় লাগিবে।

চন্দ্রের পরিক্রমকাল—পৃথিবী যেরূপ বছরে একবার সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে, চাঁদও সেইরূপ প্রায় সওয়া সাতাইশ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু পৃথিবীর বার্ষিক গতি হেতু, পৃথিবী ও সূর্য্যের সমসূত্রে আসিতে, চন্দ্রের আরও প্রায় সওয়া দুইদিন অর্থাৎ মোট সাড়ে উনত্রিশ দিন লাগে।

চন্দ্রের কলা ও তাহার হ্রাসবৃদ্ধি—চাঁদের নিজস্ব আলোক কিছুই নাই। সূর্য্যের আলোক চাঁদের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হয় বলিয়াই চাঁদকে আলোকিত দেখায়। চাঁদের যে অৰ্দ্ধেক অংশ সূর্য্যের সম্মুখে থাকে, তাহার উপরই সূর্য্যের আলোক পড়ে, অপর অৰ্দ্ধ অন্ধকারে আবৃত থাকে। কিন্তু ঐ আলোকিত অংশটুকু সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী হইতে সকল সময় দেখা যায় না। চাঁদের যে অৰ্দ্ধেক অংশ পৃথিবীর সম্মুখস্থ, তাহাই মাত্র পৃথিবী হইতে দেখা যাইতে পারে; আবার এই শেষোক্ত অৰ্দ্ধেক অংশের যতটুকু মাত্র

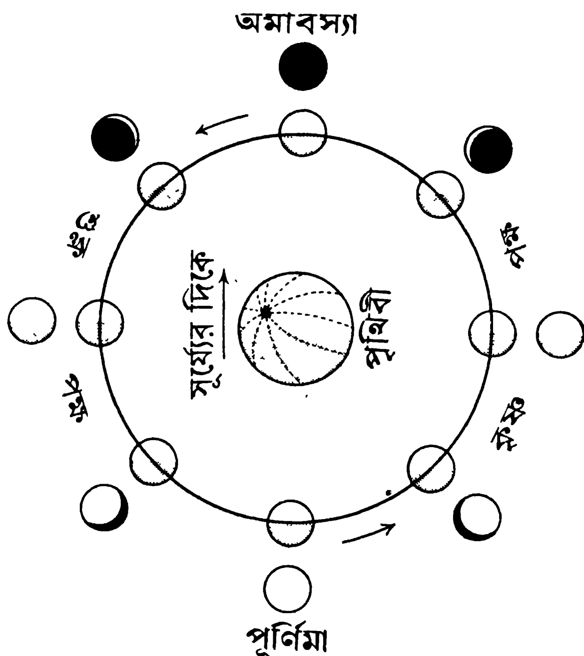


৬৫। চাঁদের কলা

সূর্য্যালোকে আলোকিত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। উপরের চিত্র হইতে ইহা বুঝা যাইবে। চন্দ্রের ক খ ঘ অংশ সূর্য্যের সম্মুখে আছে, তাহাই আলোকিত হইবে। কিন্তু পৃথিবীর সম্মুখে গ খ ঘ অৰ্দ্ধেক অংশ আছে। সুতরাং পৃথিবী হইতে খ চ ঘ অংশ আলোকিত দেখা যাইবে। চন্দ্র বলের মত গোল; সেইজন্য ক খ এবং গ ঘ সরল রেখা না হইয়া দুইটি গুরুবৃত্ত (great circle)। এই দুই গুরুবৃত্তের মধ্যবর্ত্তী ছোট অংশটি একটি কমলালেবুর কোষের মত হইবে, এবং তাহার উপরিভাগকেই দূর হইতে চিত্রের কলার ন্যায় দেখাইবে।

এই ক্ষেত্রে খ ছ ঘ কোণ সূক্ষ্ম। এই কোণটি স্থূল হইলে চন্দ্রকলা ১ম চিত্রের অপর (বৃহত্তর) অংশের ন্যায় দেখাইবে।

পূর্ণিমার সময় পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের মাঝখানে থাকে, তখন আলোকিত অর্দ্ধেক অংশ সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়। তাহার পর চন্দ্র



৬৬। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি

পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে স্থান পরিবর্ত্তন কালে তাহার আলোকিত অর্দ্ধেকের ক্রমশঃই কম অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যাইবে।

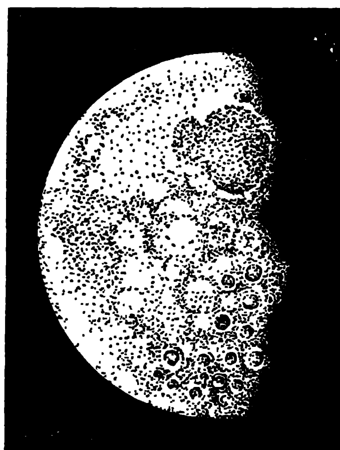
অমাবস্যার সময় চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে থাকে বলিয়া পৃথিবী হইতে চন্দ্রের আলোকিত অংশ কিছুমাত্র দেখা যায় না। অমাবস্যার পর হইতে আবার আলোকিত অংশ ক্রমেই বেশী দেখা যাইবে। ইহাকেই চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি (phases of the moon) বলা হয়। অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত, ক্রমশঃ চাঁদের কলা বাড়িতে থাকে, সেই পনের দিন শুক্লপক্ষ এবং পূর্ণিমার পর হইতে পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত চাঁদের কলা কমিতে থাকে বলিয়া ঐ পনের দিন কৃষ্ণ পক্ষ। চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য্য এক সমতলক্ষেত্রে (plane) নাই, সেই জন্যই পূর্ণিমার সময় চাঁদ সূর্য্যের উল্টাদিকে থাকিলেও পৃথিবী হইতে দেখা যায়।

চন্দ্রের আয়তন ও ওজন—চাঁদ পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট। চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চারি ভাগের একভাগ এবং উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। চাঁদের ওজন পৃথিবীর ওজনের প্রায় আশী ভাগের একভাগ।

সূর্য্য পৃথিবীকে টানিয়া রাখিয়া :নিজের চারিদিকে ঘুরায়। পৃথিবীও সেইরূপ চাঁদকে ছোট পাইয়া নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে। জড় পদার্থের একের অন্যের উপর এইরূপ টানকেই মহাকর্ষ বলে।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রও তাহার অক্ষের (axis) চারিদিকে ঘোরে; একবার ঘুরিতে প্রায় সওয়া সাতাইশ দিন লাগে। অর্থাৎ এই সময়ে চন্দ্রও পৃথিবীর চারি পাশে একবার ঘুরিয়া আসে। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সহজে বুঝা যাইবে। একটি ঘরের মাঝখানে একটি আলোক আছে। একটি বালক আলোকের দিকে মুখ করিয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিবার

সময় সর্ব্বদাই অলোকের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইলে তাহাকেও নিজের অক্ষের চারিদিকে অল্প অল্প করিয়া ঘুরিতে হইবে এবং ঘরের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিলে সেও নিজে চারিদিকে একবার ঘুরিবে। যে কোন সময় আলোক হইতে তাহার দেহের অর্দ্ধেক অংশ দেখা যাইবে, এবং সে সর্ব্বদাই আলোকের দিকে চাহিয়া আছে বলিয়া, তাহার শরীরের সম্মুখের অর্দ্ধেক অংশই সকল সময় আলোক



৬৭। কৃষ্ণা সপ্তমীতে চন্দ্র

হইতে দেখা যাইবে। বালকটিকে চাঁদ ও আলোককে পৃথিবী মনে করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, পৃথিবী হইতে চাঁদের একই অর্দ্ধাংশ সকল সময় কেন দেখা যায়।

চাঁদের কলঙ্ক—খালি চোখে চাঁদের উপর ছায়ার মত অস্পষ্ট কাল দাগ দেখা যায়। এগুলিকে চাঁদের কলঙ্ক বলে। দূরবীন দিয়া চাঁদ দেখিলে এই কলঙ্কগুলি কি তাহা বেশ বুঝা যায়। পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা চাঁদের উপরিভাগ অনেক বেশী অসমান। কলঙ্কগুলিকে পণ্ডিতেরা শুষ্ক সমুদ্রগর্ভ বলিয়া মনে করেন।

চাঁদের উপর অনেকগুলি উঁচু পাহাড় দেখা যায়, অনেকগুলি বড় বড় গর্ত্তও (crater) দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে কোন গহ্বর অপেক্ষা এগুলি অনেক বড়। চাঁদের পাহাড়গুলিও বেশ উঁচু। পণ্ডিতেরা পাহাড়গুলির উচ্চতা মাপিয়াছেন। সকলের চেয়ে উঁচু পাহাড় প্রায় ২৬০০০ ফুট। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে উঁচু পাহাড় হইতেছে মাউণ্ট এভারেষ্ট। তাহার উচ্চতা ২৯,০০০ ফুটের কিছু বেশী। কিন্তু চাঁদ পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। অতএব পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে চাঁদের পাহাড়গুলি অনেক উঁচু।

চাঁদের আবহাওয়া—চাঁদের আবহাওয়া অদ্ভুত ধরণের। যেদিকে সূর্য্যের অলো পড়ে সে দিকে অত্যন্ত গরম, এত বেশী গরম যে সেখানে জল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিবে। আবার যেদিকে সূর্য্যের আলোক পড়ে না সেদিক্ অত্যন্ত ঠাণ্ডা, এত বেশী ঠাণ্ডা যে পৃথিবীর যে কোন পদার্থ সেখানে জমিয়া কঠিন হইয়া যাইবে। পণ্ডিতেরা চাঁদকে ভাল করিয়া দেখিয়া অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে চাঁদের উপর অনেকগুলি বড় বড় **আগ্নেয়গিরি** (volcano) ছিল। সেই আগ্নেয়গিরিগুলি হইতে ভস্ম, গলিত লাভা বাহির হইয়া চাঁদকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কবি কল্পনাচোখে চাঁদের যে মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন, বৈজ্ঞানিকদের নিকট তাহা ভস্মস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূর্য্য ও চন্দ্রের তুলনা ঃ

সূর্য্য	চন্দ্র
১। গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে।	১। সওয়া সাতাইশ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে।
২। সূর্য্যের আলোক পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে।	২। নিজের আলোক নাই। সূর্য্যের আলোক চাঁদে পড়িয়া প্রতিফলিত হয়।
৩। সূর্য্যের উত্তাপের তারতম্যে পৃথিবীর ঋতু পরিবর্ত্তন হয়।	৩। ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই।
৪। পৃথিবী হইতে সূর্য্য নয় কোটি আটাশ লক্ষ মাইল দূরে আছে।	৪। পৃথিবী হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে আছে।
৫। সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৬৫০০ মাইল।	৫। চন্দ্রের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় $\frac{১}{৪}$ ভাগ।
৬। আয়তন পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ।	৬। পৃথিবীর আয়তনের $\frac{১}{৫০}$ ভাগ।
৭। ওজন পৃথিবীর ৩৩৩০০০ গুণ।	৭। পৃথিবীর ওজনের $\frac{১}{৮০}$ ভাগ।
৮। ঘনত্ব পৃথিবীর $\frac{১}{৪}$ ভাগ।	৮। ×
৯। বিভিন্ন মণ্ডল ঃ (ক) আলোকমণ্ডল (খ) বর্ণমণ্ডল (গ) ছটামণ্ডল	৯। ×
১০। ×	১০। পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা চাঁদের উপরিভাগ অনেক বেশী অসমান—এই গর্ত্ত-গুলিকে চাঁদের কলঙ্ক কহে।

Questions

1. Name the different planets in order of their distance from the sun beginning with the nearest.
2. State the distances of the planets from the sun and their periods of revolution round the sun.
3. What is a satellite? Which of the planets have got satellites and how many?
4. Which is the biggest planet? What is its size as compared to that of the earth?
5. Write what you know about the planets Mars and Saturn.
6. Write what you know about the size and weight of the moon, its distance from the earth, and its period of revolution round the earth.

তৃতীয় অধ্যায়

সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

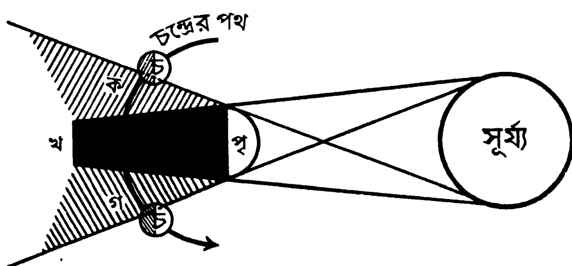
(Eclipses of Sun and Moon)

চন্দ্র যেমন পৃথিবীর চারিদিকে আপন পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সেইরূপে পৃথিবীও নিজের পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাতে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। একটি বড় বৃত্তের মাঝখানে একটি আলোক রহিয়াছে। একটি বালক সূতায় একটি ঢিল বাঁধিয়া তাহার মাথার উপর ঘুরাইতেছে, এবং ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঐ বৃত্তের উপর দিয়া আলোকটিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এখানে আলোকটির সহিত সূর্য্যের, বালকটির সহিত পৃথিবীর, এবং ঢিলটির সহিত চন্দ্রের তুলনা করা যাইতে পারে।

আমরা পদার্থবিদ্যায় পড়িয়াছি যে, আলোকরশ্মি সব সময়ে সোজা পথে চলে। যখন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে আসিয়া পড়ে, তখন আমরা চাঁদের আলোক দেখিতে পাই না, কারণ তাহার অন্ধকারময় অংশটি আমাদের দিকে থাকে। এই সময় চাঁদকে **অমাবস্থার** চাঁদ বলে। আবার চাঁদ যখন সূর্য্যের ঠিক উল্টাদিকে থাকে, তখন চাঁদের আলোকিত অংশটি সম্পূর্ণ দেখা যায়। উহাই **পূর্ণিমার চাঁদ**।

চন্দ্রগ্রহণ—অমাবস্থা ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য একটি সরল রেখার উপর অবস্থান করে। পূর্ণিমার সময় চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়িলেই **চন্দ্রগ্রহণ** হয়। আমরা চাঁদকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। মনে হয়, তাহার উপর কে যেন একটি কাল পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছে।

এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখি না কেন? যদি চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য একই সমতল ক্ষেত্রে অবস্থান করিত, তাহা হইলে প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই পৃথিবী



৬৮। চন্দ্রগ্রহণ

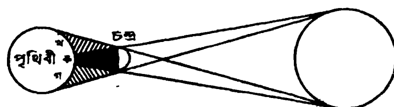
চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিত এবং চন্দ্রগ্রহণ হইত। কিন্তু চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য একই সমতল ক্ষেত্রে অবস্থান করে না। চাঁদের প্রদক্ষিণক্ষেত্র

পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-ক্ষেত্রের সহিত প্রায় ৫ ডিগ্রী কোণ (angle) করিয়াছে। কাজেই পূর্ণিমার সময় যদি চন্দ্র পৃথিবীর কক্ষতলের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই চন্দ্রগ্রহণ হইবে।

চন্দ্রগ্রহণ দুই প্রকার—**পূর্ণ গ্রহণ** এবং **আংশিক গ্রহণ**। পূর্ণ গ্রহণের সময় চন্দ্র খ চিহ্নিত প্রচ্ছায়ায় সম্পূর্ণ প্রবেশ করিলেও চন্দ্রের থালাটি দেখা যায়, এবং তাহা পিঙ্গলবর্ণ দেখায়। কিন্তু আংশিক গ্রহণ হইলে, যে অংশ প্রচ্ছায়ায় প্রবেশ করে তাহাও সম্পূর্ণ কাল দেখায়।

চিত্রের যে অংশটি অপেক্ষাকৃত কাল সেই অংশে চাঁদ প্রবেশ করিলে, তাহা পৃথিবীর ছায়া দ্বারা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িবে। তখন পূর্ণগ্রহণ দেখা যাইবে। ক ও গ অংশে চন্দ্র থাকিলে উহা আংশিক ভাবে পৃথিবীর ছায়ায় পড়িবে এবং তাহাতে চন্দ্র অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল দেখাইবে, কিন্তু গ্রহণ হইবে না। যদি চন্দ্রের এক অংশ খ চিহ্নিত কাল প্রচ্ছায়ার মধ্যে পড়ে কিন্তু বাকী অংশ তাহার বাহিরে ক বা গ চিহ্নিত উপচ্ছায়ায় থাকে, তবে আংশিক গ্রহণ হইবে।

সূর্য্যগ্রহণ—যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সূর্য্যের আলোক পৃথিবীতে আসিবার পথে চন্দ্রের দ্বারা বাধা

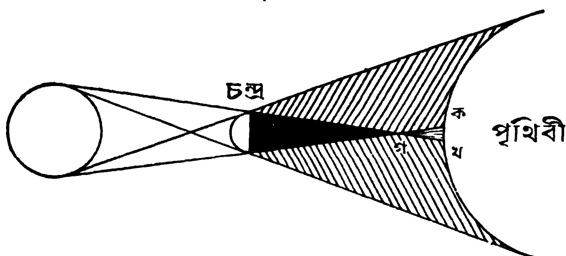


৬৯। সূর্য্যগ্রহণ (পূর্ণ ও আংশিক)

পায়। তখনই **সূর্য্যগ্রহণ** হয়। কাজেই সূর্য্যগ্রহণ অমাবস্যা ছাড়া হইতে পারে না। যে কারণে প্রত্যেক পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে না, ঠিক সেই কারণেই প্রত্যেক অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হয় না।

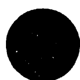
সূর্য্যগ্রহণ তিন প্রকারের—**(১) পূর্ণ গ্রহণ, (২) আংশিক গ্রহণ,** এবং (৩) **বলয় গ্রহণ।**

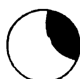
পৃথিবীর ক অংশে পূর্ণ গ্রহণ দেখা যাইবে এবং খ ও গ অংশ হইতে আংশিক গ্রহণ দেখা যাইবে (৬৯নং চিত্র)। বলয় গ্রহণের কারণ পরের চিত্রটির সাহায্যে বুঝা যাইবে।



৭০। বলয় গ্রহণ

একটি পয়সা চোখের সামনে ধরিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিলে সূর্য্যকে দেখা যাইবে না। ক্রমশঃ পয়সাটি দূরে লইয়া যাইলে এক সময় সূর্য্যের চারিদিক্ দেখা যাইবে। কিন্তু মাঝখান মোটেই দেখা যাইবে না। চন্দ্র যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে আসিয়া এই অবস্থার সৃষ্টি করে, তখনই সূর্য্যের বলয় গ্রহণ হয়।







৭১। সূর্য্যগ্রহণের প্রকারভেদ

চন্দ্রের ছায়ার শঙ্কুটি (cone) গ বিন্দুতে শেষ হইয়াছে। যদি উল্টাদিকে ইহাকে বাড়াইয়া দেওয়া যায় তবে আর একটি শঙ্কু গঠিত হইবে। পৃথিবীর যে অংশ ক ও খ এর মধ্যে পড়িবে. ঐ অংশ

হইতে সূর্য্যের বলয়গ্রাস দেখা যাইবে। তিন প্রকার সূর্য্যগ্রহণের তিনটি ছবি দেওয়া হইল।

পণ্ডিতেরা গ্রহণের সময়, কোন্ প্রকারের গ্রহণ হইবে, পৃথিবীর কোন্ স্থান হইতে দেখা যাইবে, প্রভৃতি হিসাব করিয়া পূর্ব্বেই বলিতে পারেন। এক বৎসরে পৃথিবী হইতে কতগুলি গ্রহণ দেখা যাইতে পারে তাহাও বলা যায়। তবে কোন এক বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ও পাঁচটি সূর্য্যগ্রহণের বেশী দেখা যাইবে না। এক বৎসরে অন্ততঃ দুইটি সূর্য্যগ্রহণ হইবে; চন্দ্রগ্রহণ কোন কোন বৎসরে একেবারে নাও হইতে পারে।

আমাদের ঠাকুরমা দিদিমারা বলেন যে, রাহুনামক দৈত্য চন্দ্র-সূর্য্যকে গিলিয়া ফেলে বলিয়াই গ্রহণ হয়। বলা বাহুল্য, ইহা উপকথা। গ্রহণ প্রাকৃতিক নিয়মেই হইয়া থাকে।

Questions

1. Explain with the help of a diagram how an eclipse of the moon takes place.
2. What are the different types of solar eclipse? Explain each case with the help of a diagram.

ভূতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীর উৎপত্তি

ভূতত্ত্ব—পৃথিবীর জন্ম, উহার বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ গঠন, ভূগর্ভস্থ বিবিধ খনিজদ্রব্যের তত্ত্ব, ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে ভূতত্ত্ব (Geology) কহে।

পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস—সৌর জগতের গ্রহগুলির মধ্যে পৃথিবী অন্যতম। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবী তাহার উপগ্রহ চন্দ্রকে লইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর উৎপত্তির বিষয় বহু বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা করিয়াছেন।

(১) **জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক কেণ্ট ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপলাসের মত** (নীহারিকা বাদ)—এই মতানুসারে আমাদের সৌরজগৎ ছিল নীহারিকাবস্থায় বহুদূর বিস্তৃত। এই নীহারিকা ছিল ভীষণ গরম জলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। কোটি কোটি বৎসর আকাশে ঘুরিবার কালে এই পিণ্ডের বহির্ভাগ ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা হইবার কারণে আকারও ছোট হইল এবং ইহাতে বেগও বাড়িয়া গেল। ঠাণ্ডা হওয়াতে পিণ্ডের বিষুবরেখার নিকট অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্থানে একটি বলয়ের সৃষ্টি হইল। ভিতরে পিণ্ডটির গতি বেশী হওয়ায় সে বলয় হইতে পৃথক্ হইয়া গেল। বলয়টি ঘুরিতে ঘুরিতে

ক্রমে চ্যাপ্টা হইয়া গ্রহে পরিণত হইল। এইরূপে ৯টি গ্রহের সৃষ্টির পর, পিণ্ডের যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাই এখনকার সূর্য্য।

(২) **বৈজ্ঞানিক জিন্‌স্‌ ও জেফ্রিসের মত** (গ্রহকণিকা বাদ) —জিন্‌স্‌ ও জেফ্রিসের মতে একটি বিরাট তারকা বহুকাল পূর্ব্বে সূর্য্যের খুব নিকট দিয়া যাইতেছিল। দূর হইতে নিকটে আসিবার সময় সূর্য্যের উপর ইহার মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব দেখা গেল। চন্দ্রের আকর্ষণ প্রভাবে যেমন সমুদ্রে জোয়ার আসিয়া উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, সেইরূপ এই তারকাটির আকর্ষণ প্রভাবে সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পীয় গোলকের উপর এক জ্বলন্ত বাষ্পের পিণ্ড ঠেলিয়া বাহির হইল। তারকাটি যতই নিকটে আসিতে লাগিল পিণ্ডটি ততই সূর্য্য হইতে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে তারকাটি সূর্য্যের এমন নিকটে আসিয়া পড়িল যে, তাহার আকর্ষণের প্রভাব পিণ্ডটির উপর সূর্য্যাপেক্ষা বেশী পড়ায় উহা সূর্য্য হইতে বাঁকা শশার আকারে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পিণ্ডটি তারকার উপর পড়িবার পূর্ব্বেই তারকাটি যে দিক হইতে আসিতেছিল তাহার বিপরীত দিকে সূর্য্য হইতে দূরে গিয়া পড়িল। সে কারণ সূর্য্য হইতে আর বেশী বাষ্প বাহির হইল না।

এই প্রকাণ্ড বাষ্পপিণ্ডটি সূর্য্য হইতে পৃথক্‌ হইয়া অন্তরীক্ষে তাপ ছড়াইতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমশঃ শশাকার পিণ্ডটি ভাঙ্গিয়া কয়েকটি তরল গোলকে পরিণত হইল।

সূর্য্য ও আগন্তুক তারকার আকর্ষণ শক্তির মাঝে পড়িয়া সেই তরল গোলকগুলি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই তরল গোলকগুলি এক একটি গ্রহ, এবং আমাদের পৃথিবী এই গোলকগুলির মধ্যে একটি।

পৃথিবীর শৈশব—উৎপত্তির পর পৃথিবী তরল গোলকরূপে সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় অন্তরীক্ষে তাপ ছড়াইতে লাগিল ও তাহাতে তাহার দেহ শীতল হইয়া আসিল। তরল দেহ শীতল হইবার সময় তাহার এমন কতকগুলি উপাদান ছিল যাহা শীতল হইয়া কঠিন হইতে লাগিল। উপাদানগুলি পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে গুরু হইতে লঘু ভাবে বিন্যস্ত হইয়া পড়িল।

ক্রমে পৃথিবীর উপরিভাগ বেশ শীতল ও উহার উপর একটি কঠিন শিলাময় আবরণের সৃষ্টি হইল।

পৃথিবীর উপাদানের মধ্যে প্রচুর জলীয় বাষ্প ছিল। সেই জলীয় বাষ্প হইতে কিয়দংশ জলরূপে তাহার দেহের ঢালু অংশে সঞ্চিত হইল। ইহা ছাড়া অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস মিলিয়া বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করিল। ইহাই বৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনা।

এইরূপে পৃথিবীর বর্ত্তমান স্থল, জল ও বায়ুমণ্ডল বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজিকার বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত হওয়ার কারণ—জলীয় বাষ্প জলাকারে পরিণত হইবার সময় বাষ্পে যে সমস্ত লবণজাতীয় দ্রবণীয় পদার্থ ছিল তাহা জলে দ্রব হইয়া গিয়াছে এবং এই জন্যই সমুদ্রের জল প্রথম হইতেই লবণাক্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জল সূর্য্যতাপে বাষ্পাকারে উঠিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টির আকারে আবার পতিত হয়। স্থলের উপর বৃষ্টি পড়িলে উহা নদী নালা ইত্যাদি বহিয়া পুনরায় সমুদ্রে আসিয়া মিশে। আসিবার সময় কিছু লবণ পদার্থ উহাতে দ্রব হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়ে। এই কারণে সমুদ্রের জলের লবণভাগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

পৃথিবীর বয়স—বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন পৃথিবীর বয়স ২০০ হইতে ৩০০ কোটি বৎসর। এই অনুমান সাপক্ষে তাঁহারা বলেন ঃ—

(১) সৌরজগৎ ছায়াপথে জন্মলাভ করিয়া ক্রমশঃ দূরে যাইতেছে। যে গতিতে সৌরজগৎ চলিতেছে তাহাতে ছায়াপথ হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে ২০০ হইতে ৩০০ কোটি বৎসর লাগিয়াছে। অতএব পৃথিবীর বয়সও ঐরূপ।

(২) পৃথিবী যখন তরলাবস্থায় ছিল সেই সময় পৃথিবী হইতে চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। চন্দ্র ক্রমেই পৃথিবী হইতে দূরে যাইতেছে। আজ পর্য্যন্ত চন্দ্র যতটা গিয়াছে তাহাতে কত সময় লাগিয়াছে হিসাব করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর তরলাবস্থা ২০০ হইতে ৩০০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে ছিল।

(৩) পৃথিবীর শিলাবরণের কতকগুলি উপাদান যেমন ইউরেনিয়ম, রেডিয়ম, থোরিয়ম প্রভৃতি আপনা আপনি এক হইতে অন্য পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ও নূতন পদার্থ হিলিয়ম, সীসা, প্রভৃতির সৃষ্টি করে। স্থানভেদে এইরূপ কয়েকটি উপাদান পরীক্ষা করিয়া তাহাদের কতখানি পরিবর্ত্তন এবং কতটা নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল অন্ততঃ ৩০০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে। এখন এই উপাদানগুলি পৃথিবী হওয়ার পর হইতে পারে, অথবা পৃথিবী যখন সূর্য্যের মধ্যে বাষ্পাকারে ছিল তখনও হইতে পারে। তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স ন্যূনাধিক ৩০০ কোটি বৎসর হইবে।

পৃথিবীর আকার—আমরা ভূগোল পাঠে জানিতে পারি যে পৃথিবীর আকার গোল, তবে সর্ব্বতোভাবে নহে। কমলালেবুর ন্যায়

দুই পাশে ঈষৎ চাপা। এই সম্পর্কে তিনটি প্রমাণ সাধারণতঃ দেওয়া হইয়া থাকে। (১) সমুদ্রতীর হইতে কোন জাহাজ কূলে আসিবার সময় লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে জাহাজের মাস্তুল অনেকদূর হইতে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পরে জাহাজ যখন নিকটে আসে, তখন ক্রমেই উহার নীচের অংশ, এবং সর্ব্বশেষে জাহাজের খোল দেখা যায়। পৃথিবী বর্তুলাকৃতি না হইলে উহা সম্ভব হইত না। (২) কোন কোন নাবিক ক্রমাগত পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে অর্ণবপোতে যাত্রা করিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। (৩) চন্দ্রগ্রহণ কালে যখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে, তখন ঐ ছায়া সর্ব্বদাই গোলাকার দেখায়। সকল অবস্থাতেই গোলাকার ছায়া পড়া পৃথিবীর বর্তুলাকৃতির একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, এবং পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূত্বক্ ও ভূগর্ভ

ভূত্বক্—আগ্নেয় ও পালল শিলা

শিলা—ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নৈসর্গিক উপায়ে উৎপন্ন **খনিজ দ্রব্যের** (mineral) সমষ্টিমাত্রকেই **শিলা** (rock) নামে অভিহিত করেন ; তা তাহারা কঠিনই হউক বা কোমলই হউক, ঘনই হউক বা আলগাই হউক। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বালি, মাটি, কাদা ইত্যাদি সবই শিলা।

শিলাসমূহের শ্রেণীবিভাগ—শিলাসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—**আগ্নেয়** (igneous), **পালল** (sedimentary) [ও ইহাব অন্তর্ভুক্ত জৈব (organically derived)] এবং **পরিবর্ত্তিত** (metamorphic)।

১। **আগ্নেয় শিলা** (Igneous rock)—যে শিলা উত্তপ্ত গলিত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ শীতল হইয়া কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকে আগ্নেয় শিলা কহে। আগ্নেয় শিলার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত **গ্রানাইট** (granite)। একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে দেখা যায় যে ইহা মূলতঃ তিন প্রকার বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। ইহার মাংসের রঙের ফিকা লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাসিত অংশ প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অংশে ইস্পাতের ছুরি দিয়া আঁচড় দিলে ইহাতে দাগ পড়ে। এই উপাদানটির নাম **ফেলস্পার** (felspar)। দ্বিতীয় উপাদান কাচের ন্যায় স্বচ্ছ এবং অত্যন্ত

কঠিন; ছুরির ফলকের দ্বারা উহাতে আঁচড়ান যায় না; এই উপাদানটির নাম **কোয়ারট্‌জ** (quartz)। গ্রানাইটের তৃতীয় উপাদান রূপার পাতের ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্র। এই উপাদানটি কখনও কখনও বা কৃষ্ণবর্ণেরও হইয়া থাকে। ছুরি দিয়া আঁচড়াইলে ইহাতে সহজেই দাগ পড়ে এবং ইহা পর্দ্দায় পর্দ্দায় খুলিয়া আসে। ইহা **অভ্র** (mica) ব্যতীত আর কিছুই নহে। গ্রানাইটের এই তিনটি উপাদান ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে।

আগ্নেয় শিলায় জীবাশ্ম বা প্রস্তরীভূত জীবের দেহ থাকে না এবং ইহা সাধারণতঃ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে না।

গলিত শিলা বা লাভা—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় গলিত শিলা বা লাভা বহির্গত হয়। লাভা শীতল হইলে কঠিন হইয়া যায়। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহার ভিতর স্থানে স্থানে পাউরুটির ভিতর যেমন ফাঁপা থাকে সেই প্রকার ফাঁপা। স্থানান্তরে আবার অপেক্ষাকৃত নিরেট এবং কেলাসিত অংশে পূর্ণ থাকে। লাভা মাত্রই আগ্নেয় শিলার অন্তর্ভুক্ত।

টাফ নামক আগ্নেয় শিলা—অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে সমস্ত ধূলা, বালি, ভস্ম, পাথরের টুকরা ইত্যাদি নির্গত হয় সেগুলি অনেক সময় জমাট বাধিয়া টাফ (tuff) নামক আগ্নেয় শিলা উৎপন্ন করে।

২। **পালল শিলা** (Sedimentary rock)—পৃথিবীর জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপ, বায়ু ও বৃষ্টির জল আগ্নেয় শিলাকে ক্রমাগত রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উপায়ে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত করিতেছে, এবং তাহার ফলে শিলাখণ্ড ও শিলাধূলির সাগর সঞ্চিত করিয়া পালল শিলার স্তর সৃষ্টি করিতেছে। পালল শিলার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত বেলে পাথর (sandstone)। আমরা যে শিল নিত্য ব্যবহার

করিয়া থাকি তাহা এই বেলে পাথরের। ইহার মূল উপাদান বালি। একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে বালুকাকণাগুলি স্তরে স্তরে সমান্তরালভাবে সজ্জিত। বেলে পাথর কাটিবার সময় দেখা যায় যে উহার একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে, যে দিক্ হইতে কাটিলে উহা পর্দ্দায় পর্দ্দায় খুলিয়া আসে।

যে সকল জীব এই সকল সঞ্চিত শিলাঞ্চলে বাস করে তাহাদের মৃতদেহ এই সকল সঞ্চিত পলির উপর পড়িয়া কালক্রমে পলি চাপা পড়ে। ফলে উহাদের দেহের কঠিনাংশ প্রস্তরীভূত হইয়া জীবাশ্মে পরিণত হয়। জীবাশ্ম থাকাই পালল শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কয়লাও এক প্রকার পালল শিলা।

জীবাশ্ম পরীক্ষা দ্বারা কি বুঝিতে পারা যায়—তোমরা অনেকেই জান যে নদীর জলে যে সমস্ত মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি জীব থাকে, সেগুলি সমুদ্রের জলের মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি হইতে অনেক ভিন্ন। আমরা কোন পাললশিলার মধ্যে যদি সামুদ্রিক গাছপালা ও জীবজন্তুর কঙ্কালের জীবাশ্ম পাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই পালল শিলা সমুদ্রগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। তেমনি আবার নদী বা হ্রদের মাছ, শামুক, কাঁকড়া, গাছপালা ইত্যাদির জীবাশ্ম থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, সেই পালল শিলা নদী বা হ্রদের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর স্থানে স্থানে এমন পালল শিলা পাওয়া যায় যাহাতে সামুদ্রিক গাছপালা ও জীবজন্তুর জীবাশ্ম রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, একসময়ে সেই স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল।

জৈব শিলা—(Organically derived rock)—জৈব শিলার উত্তম দৃষ্টান্ত চা-খড়ি বা খড়িমাটি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা

পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহা অসংখ্য জীবাণুর আবরণের (খোলার) সমষ্টি মাত্র। জীবাণুর ন্যায় উদ্ভিজ্জাণুর অবশিষ্ট হইতেও এই প্রকার শিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩। **পরিবর্ত্তিত শিলা** (Metamorphic rock)—আগ্নেয় বা পালল দুই প্রকারের শিলা হইতেই তাপ বা চাপ ইত্যাদি ক্রিয়ার ফলে পরিবর্ত্তিত (metamorphic) শিলা উৎপন্ন হয়। যথা, চূণা পাথর হইতে মার্ব্বেল পাথর, কর্দ্দম পাথর হইতে শ্লেট পাথর, আবার শ্লেট পাথর রূপান্তরিত হইয়া অভ্রশিষ্টের সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন প্রকারের শিলার উৎপত্তি—যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের শিলা আমরা পৃথিবীর বাহ্যস্তরে দেখিতে পাই, সেগুলি কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল তাহা বুঝিতে গেলে বর্ত্তমানে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে কিনা তাহা আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়।

তোমাদের মধ্যে যাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়াছ তাহারা অবশ্যই দেখিয়াছ যে, পাহাড়ের গায়ে সকল সময়েই ছোট বড় পাথরের টুকরা যেন ছড়ান থাকে। এই টুকরাগুলি যে এক সময় পাহাড়ের অংশ ছিল সে সম্বন্ধে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় না। বস্তুতঃ পাহাড় পর্ব্বতগুলি সর্ব্বদাই ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে যাইতেছে। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি বিভিন্নভাবে এই ধ্বংসলীলায় সাহায্য করিয়া থাকে। পাহাড়ের তলদেশে ছোট বড় নদী বা নালা সব সময়েই দেখা যায়। পাথরের টুকরাগুলি তাহার মধ্যে পতিত হইলে জলস্রোতে সেইগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অচিরাৎ বালুকণা বা মৃত্তিকাকণায় পরিণত হয়। যেমন জলবিন্দুমাত্রেরই শেষ গম্যস্থান সমুদ্র, তেমনি বালুকাকণা বা মৃত্তিকাকণা শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রে আসিয়া পড়ে; তবে সেটা অল্পসময়েই হউক বা হাজার হাজার বৎসরেই হউক।

বদ্বীপ—বর্ষার সময় নদীর জল ঘোলা হইয়া যায়। ইহাকে "ঢল" নামা বলে। বাংলার কোন কোন জেলার অংশবিশেষ বর্ষাকালে প্লাবিত হইয়া যায়। বর্ষান্তে জল নামিয়া গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, যেখানে জল দাঁড়াইয়াছিল সেখানে পলি পড়িয়াছে। নদীর স্রোত কোন স্থানে কোন কারণে বাধা পাইলেই সেখানে এই প্রকার পলি পড়িয়া চর ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। নদী যেখানে সমুদ্রে পড়ে সেখানেও নদীর স্রোতোবেগ হঠাৎ কমিবার দরুণ একপ্রকার ত্রিকোণ চর পড়ে। ইহাকে ব-দ্বীপ (delta) বলে। আমাদের বাংলাদেশের অনেকাংশ এইরূপ ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত, তাহা তোমরা বাংলার ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। নদীতে যেমন কাদার বা বালির চর পড়ে, সমুদ্রগর্ভেও স্থানে স্থানে এইরূপ চরের সৃষ্টি হয়।

হিমসরিৎ ও তাহার ক্রিয়া—মেরুপ্রদেশে এবং কোন কোন শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে তুষারপাতের ফলে বিস্তীর্ণ ও উচ্চ তুষার ক্ষেত্রসমূহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ক্রমে উপরের তুষারের চাপে নীচের তুষারের মধ্য হইতে অবরুদ্ধ বাতাস নির্গত হইয়া ইহা কঠিন বরফে পরিণত হয়। এদিকে অধিক চাপে বরফের গলনাঙ্ক কমিয়া যায় অর্থাৎ 0° সেন্টিগ্রেড বা তাহার কম উষ্ণতাতেও বরফ গলিয়া জল হইয়া যায়। ফলে এই সমস্ত তুষারক্ষেত্র হইতে **হিমসরিৎ** (glacier) সৃষ্টি হইয়া, যে দিকে ঢালু থাকে সেদিকে সেইগুলি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় প্রস্তরচূর্ণ এবং উপলখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্য্যন্ত এইরূপে হিমসরিৎ কর্ত্তৃক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। ক্রমে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে আসিলে হিমসরিৎ গলিয়া যায় এবং ইহার দ্বারা আনীত পদার্থসমূহ সেইস্থানেই ন্যস্ত হয়।

চরের সৃষ্টি—একটি বোতলের ভিতর বালি, মাটি, ছোট ছোট পাথরের কুচি ভরিয়া তাহার উপর জল ঢালিয়া ভাল করিয়া বোতলটি ঝাঁকাইয়া এক পাশে রাখিয়া দিলে দেখিবে যে, কিছুকাল পরে বালি, মাটি ইত্যাদি থিতাইয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে পাথরের কুচি সব নীচে রহিয়াছে; তাহার উপরে বালির স্তর এবং সর্ব্বোপরি মাটির স্তর। নদীর স্রোতোবেগ কোন কারণে হ্রাস হইলে প্রথমে অপেক্ষাকৃত ভারী শিলা ন্যস্ত হয়। পরে বালুকাকণা এবং স্রোতোবেগ আরও কমিলে মৃত্তিকাকণা থিতাইয়া পড়ে। এইরূপে একটি চরের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভূত্বক্—পৃথিবীর স্থলভাগে নানা প্রকার আগ্নেয় ও পালল শিলা ও তাহার উপর একটি মাটির আস্তরণ আছে। আগ্নেয় ও পালল শিলা প্রায় সমান স্থান অধিকার করিয়া আছে। গভীর খনি বা বৃহৎ নলকূপের ভিতরকার শিলা ও ভূমির উপরকার শিলার বিন্যাস ও উহার আকার হইতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের অল্প নীচেই আর মাটি বা পালল শিলা নাই। সেখানে কেবল আগ্নেয়শিলা ও তাহা প্রধানতঃ গ্রানাইট জাতীয়। সমুদ্রতলে ও সমুদ্রমধ্যে দ্বীপসকলের শিলাময় উপাদান পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ সকল স্থান ব্যাসল্ট জাতীয় শিলাদ্বারা গঠিত। আগ্নেয়গিরি যে লাভা উদ্গীরণ করে তাহাও প্রধানতঃ ব্যাসল্ট। মৃত আগ্নেয়গিরি হইতেও দেখা যায় যে তাহারা যে লাভা উদ্গীরণ করিয়াছে তাহাও ব্যাসল্ট জাতীয়। ইহা হইতে ধারণা করা হইয়াছে যে, অতীতের ও বর্ত্তমানের আগ্নেয়গিরি হইতে যে লাভা মহাদেশের উপর সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার গ্রানাইট শিলাময় স্তরের নীচে পৃথিবীব্যাপী এক ব্যাসল্ট স্তর আছে, ও তাহা হইতে এই সকল লাভার সৃষ্টি হইয়াছে।

স্থলগুলি প্রধানতঃ গ্রানাইট শিলায় নির্ম্মিত। সেই গ্রানাইট শিলার নীচে ও সাগরের তলদেশ দিয়া সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক স্তর আছে। গ্রানাইট স্তর ও ব্যাসণ্ট স্তরের কিছু উপরাংশ কঠিন। এই কঠিনাংশকে **ভূত্বক্** বলে।

আগ্নেয় ও পালল শিলার তুলনা :

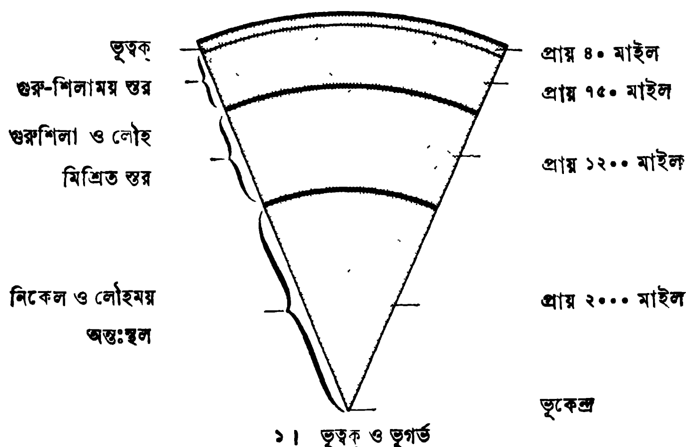
আগ্নেয় শিলা	পালল শিলা
১। জীবাশ্ম থাকে না।	১। জীবাশ্ম থাকে।
২। সাধারণতঃ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে না।	২। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের অবস্থা

ভূগর্ভ—ভূত্বকের নীচে কি আছে তাহারও আভাষ পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের মতে পৃথিবীর সমান আয়তনের জলের ওজন অপেক্ষা পৃথিবীর ওজন ৫½ গুণ। পৃথিবীর উপর যে গ্রানাইট পাওয়া যায় তাহার ওজন জলের ২·৭ গুণ। আবার ব্যাসণ্ট জাতীয় শিলা জলের প্রায় ২·৮ গুণ ভারী। পৃথিবীর অন্তঃস্থলের উপাদান নিশ্চয় ৮।১০ গুণ ভারী। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই মনে করেন, উল্কা ও পৃথিবীর উপাদান মূলতঃ এক। উল্কা লৌহ, নিকেল, শিলা, বা নিকেল ও শিলার মিশ্রণে নির্ম্মিত। তাহাতেই মনে হয় যে, পৃথিবীর অন্তঃস্থলে ব্যাসণ্ট স্তরের বহু নীচে লৌহ ও নিকেল জাতীয় ধাতু আছে।

আমরা পরের অধ্যায়ে ভূমিকম্পের বিষয় পাঠ করিব। ভূমিকম্পের কতকগুলি তরঙ্গ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতে পারে, আর কতকগুলি কেবল কঠিন

পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। এই তুই প্রকার তরঙ্গই কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়া যত দ্রুত প্রবাহিত হয়, অন্য পদার্থের মধ্য দিয়া তত দ্রুত প্রবাহিত হইতে পারে না। ভূমিকম্পের তরঙ্গ পরীক্ষা



১। ভূত্বক্ ও ভূগর্ভ

করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ভূত্বক্ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে ৪০ মাইল গভীর। মহাদেশগুলির নীচে এই ৪০ মাইলের প্রথম ২৫ মাইল লঘু গ্রানাইট শিলায় গঠিত। বাকী ব্যাসল্ট শিলার স্তর এবং উহা কঠিন। তারপর ৭৫০ মাইল পর্য্যন্ত একটি গুরু-শিলাময় স্তর ও তাহার পর ১২০০ মাইল পর্য্যন্ত একটি গুরু শিলা ও লৌহ মিশ্রিত স্তর আছে। ইহা অনেকটা 'পিচের' (Pitch) মত। আঘাত করিলে কঠিন পদার্থের মত ব্যবহার করে। ইহার পর পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরও ২০০০ মাইল লৌহ, নিকেল ও অন্যান্য ধাতু দ্বারা গঠিত। বিশেষজ্ঞের মতে এই ধাতুমণ্ডল তরল, তবে সকল বিশেষজ্ঞ একমত নহেন।

ভূগর্ভের তাপ ও চাপ—কোন খনির ভিতরে নামিলে অনুভব করিতে পারা যায় যে, যত নীচে যাওয়া যায় ততই ভিতরের উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। বহু গভীর খনি ও নলকূপের ভিতর উষ্ণতা নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে, যে উষ্ণতা গড়ে প্রতি ১২০ ফুটে ১০° ডিগ্রী বাড়ে। ইহা হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তথাকার তাপ অত্যন্ত বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু যত নীচে যাওয়া যায় ততই তাপবৃদ্ধির হার কমিয়া আসে। তাহা হইলেও ২৫ মাইল নীচে প্রায় ৯৫০° সেণ্টিগ্রেড, ৪০ মাইল নীচে প্রায় ১২০০° ডিগ্রী এবং ৬০ মাইল নীচে ১৫০০° উষ্ণতা হইবে। সুতরাং নীচে তাপবৃদ্ধির হার ক্রমশঃ যতই কম হউক, পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপ কল্পনাতীত! আবার পৃথিবীর যতই নীচে যাওয়া যায়, ততই ভিতরের শিলার উপর উপরের শিলার চাপ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডলের যে চাপ, ভূপৃষ্ঠের ৪০ মাইল নীচে শিলার উপরের চাপ তাহার প্রায় ১৭,০০০ গুণ অধিক। ইহা হইতে বুঝা যায় পৃথিবীর আরও ভিতরে চাপ কত বেশী!

পৃথিবীর ৬০।৭০ মাইল নীচে যে উষ্ণতা তাহাতে সেখানকার উপাদান ব্যাসল্ট শিলা তরলাবস্থায় থাকার কথা, কিন্তু সেখানে চাপ এত অধিক যে উহাকে তরলাবস্থায় আনা কঠিন। এই কারণে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবীর ৬০।৭০ মাইল কেন তাহার আরও নীচে পৃথিবীর উপাদান এক অকঠিন অবস্থায় আছে এবং যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ঐ পর্য্যন্ত নলকূপ খনন করিয়া চাপ অপসারণ করিয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে ঐ সকল উপাদান তরলাবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে ঠেলিয়া আসিত।

ভূত্বকের নীচে পৃথিবীর উপাদানের অবস্থা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কারণের জন্য অনুমান করা হয় যে, গ্রানাইট জাতীয় কঠিন শিলায় গঠিত মহাদেশগুলি নীচের অকঠিন ব্যাসল্টশিলার খানিকটা ভিতরে চাপিয়া বসিয়া আছে। ভূত্বকের গ্রানাইট অংশ ব্যাসল্ট আস্তরণের উপর এইরূপ অবস্থিত হইয়া মহাদেশ ও মহাসাগরের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে মহাদেশের অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রের জলে গিয়া পড়ায়, মহাদেশের উপরের অংশের ভার কমিয়া যাওয়ায় সেগুলি ঠেলিয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী শীতল হওয়াতে সঙ্কোচন হইয়াছে ও তাহার ফলে ভূসংক্ষোভ ঘটিয়াছে। ইহাতে অকঠিন স্তরের শিলা আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠে উঠিয়া পড়িয়াছে। এই সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অনবরতই চলিতেছে ও ক্রমাগতই ভূত্বকের পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে।

Questions

1. What is the nature of the earth's crust?
2. What do you know about the probable condition of the interior of the earth?
3. What are the causes which produce changes in the earth's crust?



তৃতীয় অধ্যায়

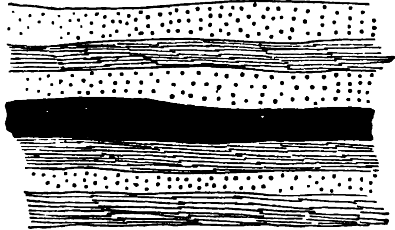
ভূচাঞ্চল্য

পৃথিবীর বহিঃস্থ আবরণের চাঞ্চল্য

পৃথিবীর বাহ্য গঠন পরিবর্ত্তনের অধীন— পৃথিবীর উপরিভাগ সমতল নহে ইহা তোমরা জান। কোথাও বা সু-উচ্চ পর্ব্বত, আবার কোথাও বা অতলস্পর্শী সমুদ্র। কিন্তু পৃথিবীর এই বাহ্য গঠন শাশ্বত নহে, তাহার দুই একটি প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। দুই চারি বৎসরে কোন পরিবর্ত্তন দেখা না গেলেও, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বৎসরে ইহার বাহ্যগঠনের আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজ যেখানে বিরাট পর্ব্বত, এক সময় সেখানে হয়ত মহাসমুদ্র ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। কালে তাহা আবার সমুদ্রগর্ভে যাইবে কি না কে বলিতে পারে?

যাহারা পদ্মানদীর ধারে বাস করে তাহারা সকলেই জানে যে, নদীর পাড় সর্ব্বদাই কোথাও বা ভাঙ্গিতেছে কোথাও বা নদীর ধারে বা নদীর মধ্যে চর পড়িতেছে। সমুদ্রকূলেও কোন কোন স্থানে বেশ লক্ষ্য করা যায় যে, স্থানবিশেষ সমুদ্রকূল হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে অর্থাৎ সেখানে সমুদ্রকূলের জমি উঁচু হইয়াছে বা হইতেছে। অন্যস্থানে আবার সমুদ্রকূল নীচু হইয়া গিয়াছে। যেখানে আগে জোয়ারের সময় জল উঠিত না, সেখানে হয়ত এখন ভাঁটার সময়ও জল থাকে।

পালল শিলা কিভাবে গঠিত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। প্রথমাবস্থায় ইহার স্তরগুলি অবশ্য চক্রবালের সহিত সমান্তরাল (horizontal) থাকে। কিন্তু আমরা পৃথিবীর নানাস্থানে যে সমস্ত পালল শিলা দেখিতে পাই, তাহার স্তরগুলি অনেক সময় **কাৎ** (tilted), বা **ভাঁজ** (folded) অবস্থায়, এমন কি কখন কখন **খাড়া** (vertical) অবস্থায়, থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পৃথিবীর বহিঃস্থ আবরণ স্থির নহে। বস্তুতঃ ইহাতে সকল সময়েই একটা মৃদু আন্দোলন (movement) রহিয়াছে।

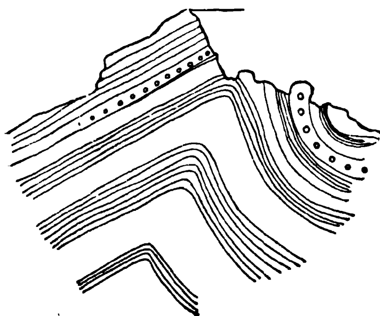


২। পালল শিলা

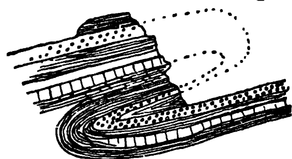
পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর বহির্ভাগ শীতল হইয়া গেলেও ইহার অভ্যন্তরভাগ বিশেষ উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। অভ্যন্তরভাগের এই উত্তাপ নীচের দিকে ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর। বস্তুতঃ এই উত্তাপের ফলেই নিম্নস্থ ধাতবপদার্থগুলি অংশতঃ গলিত অবস্থায় এবং অপরিমিত চাপের অধীন রহিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর যে অংশের সহিত আমরা পরিচিত তাহার অধিকাংশই পালল শিলা বা জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণু হইতে উৎপন্ন শিলা। অপেক্ষাকৃত কম অংশ আগ্নেয় শিলায় গঠিত। পালল শিলাগুলি জলে নিহিত হইবার সময় যদিও সমান্তরাল ভাবে স্তরে স্তরে নিহিত হইয়াছিল, তথাপি এখন আমরা দেখিতে পাই যে, এগুলি সর্ব্বত্র সমান্তরাল ভাবে নাই। খিলানের আকারে গঠিত হইয়া কোন স্থানে উচ্চ

হইতে উচ্চে উঠিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে সংলগ্ন অথবা তাহার নিকটস্থ হইয়াছে। আবার সেই স্তরটি কোন কোন স্থানে নিম্নগামী হইয়া একটা বিরাট বাটির আকার ধারণ করিয়াছে। স্থানবিশেষে আবার ভাঁজ (fold) হইয়া গিয়াছে। নিম্নে দুইটি বিশেষ ভাঁজের ছবি রহিয়াছে। ইহা হইতে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।



৩। ভাঁজ

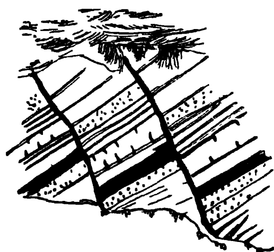


৪। ভাঁজ (অন্য জাতীয়)

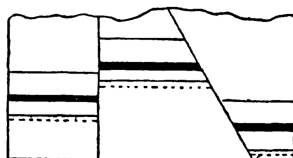
কয়েকটি ছিটের থান একটির উপর আর একটি সাজাইয়া দুই ধার হইতে চাপ দিলে থানগুলির যে অবস্থা হয়, পালল শিলার স্তরগুলি অনেক সময় সেই অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাঁজের উৎপত্তি ও স্তরচ্যুতি—নানা কারণে ভাঁজের উৎপত্তি হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উষ্ণ। ইহা যতই শীতল হইতেছে, ততই সঙ্কুচিত হইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ইহার সংলগ্ন স্তর পূর্ব্বে যে চাপের অধীন ছিল, তাহারও অনেক তারতম্য ঘটিতেছে। ফলে কখনও কখনও এই স্তর কুঞ্চিত

হইয়া ভাঁজ উৎপাদন করে, কখনও বা এই স্তর ফাটিয়া অংশত বসিয়া গেলে **স্তরচ্যুতি** (fault) উৎপাদন করে।



৫। স্তরচ্যুতি



৬। স্তরচ্যুতি (অন্য প্রকার)

তোমাদের মধ্যে যাহারা কখনও কয়লার খাদে নামিয়াছ তাহারা অবশ্য দেখিয়াছ যে, অনেক সময় যে স্তরে কয়লা থাকে তাহা কিছুদূর গিয়া হঠাৎ থামিয়া যায়; পরে কিছু উচ্চে বা নিম্নে আবার সেই স্তরটি পুনরায় পাওয়া যায়। খনির স্থানবিশেষ কোন কারণে বসিয়া যাওয়ার বা উচ্চ হইবার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে।

ভূমিকম্পের কারণ—ভূস্তরে ফাট ধরা অথবা যেখানে ফাট ধরিয়াছে তাহার একদিক্ বসিয়া যাওয়া ভূমিকম্পের একটি প্রধান কারণ। পুকুরে ঢিল ফেলিলে যেমন একটি তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়, তেমনি ভূমিকম্পের তরঙ্গও উৎপত্তিস্থান হইতে পৃথিবীর বহিঃস্তর ও পৃথিবীর মধ্য দিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গবেষণাদ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন কোন স্থান বিশেষরূপে এই প্রকার স্তরের উপর সংস্থাপিত। এই স্থানগুলি পৃথিবীর একটি কটিবন্ধের উপর স্থাপিত বলিয়া কল্পনা করিয়া

তাঁহারা উহার নাম দিয়াছেন **প্রকম্পন কটিবন্ধ** (seismic belt)। বস্তুতঃ এই কটিবন্ধের উপরিস্থ দেশসমূহ প্রায়ই ভূমিকম্প দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। তোমাদের চোখের উপর এই সেদিন উত্তর বিহার বা ত্রিহুত, এবং তাহার পরই কোয়েটা সহর, ভূমিকম্পে কি ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত হইল! সহস্র সহস্র লোক মারা গেল,—লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হইল।

ভূমিকম্প কোথায় বেশী হয়—জাপানে ত ভূমিকম্প একটি সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এসিয়া মহাদেশে দুইটি প্রধান "প্রকম্পন কটিবন্ধ",—একটি জাপানের উপর দিয়া ও অপরটি উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিস্তৃত। সেজন্য এই সকল দেশে ভূমিকম্পের আশঙ্কা অনেক বেশী।

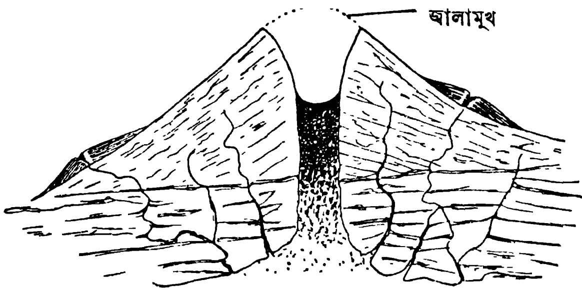
ভূমিকম্পের ফল—ভূমিকম্পের শুধু বিধ্বংসীলীলার সহিতই আমরা পরিচিত নহি। ইহার একটা গঠনের দিকও আছে। ভূমিকম্পের ফলে অনেক উর্ব্বর ক্ষেত্র যেমন অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে, তেমনই অনেক উষর মরু উর্ব্বর হইয়া উঠে। নদী তাহার জলধারার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া মরুর বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া চলে,—কত দেশ সমুদ্রবক্ষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, আবার কত দ্বীপ সমুদ্রের বুকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়।

ভূ-কম্পন-লেখক যন্ত্র (Seismograph)—ইহার সাহায্যে ভূমিকম্প-তরঙ্গের গতি, পথ, প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

আগ্নেয় গিরি

পৃথিবীতে এমন অনেক পাহাড়-পর্ব্বত আছে, যাহা হইতে কখনও কখনও নানাপ্রকার গলিত প্রস্তর বা লাভাপ্রবাহ, গরম জল,

বাষ্প ইত্যাদি নির্গত হয়। ভূগোলে তোমরা এট্‌না, ভিসুভিয়স প্রভৃতি এই প্রকার অনেক আগ্নেয় গিরির নাম পড়িয়াছ। ভূমিকম্পের সঙ্গে আগ্নেয় গিরির যত নিকট সম্পর্ক বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ ততটা নহে। আগ্নেয়োচ্ছ্বাস বেশী হইলে ভূমিকম্প কম হইবার কথা।



৭। আগ্নেয় গিরির নিশ্চল অবস্থার অনুদীর্ঘচ্ছেদ

পাহাড়ের যে মুখ দিয়া এই অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাকে **জ্বালামুখ** (crater) বলে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে যে গলিত ধাতু ইত্যাদি রহিয়াছে, অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বালামুখ দিয়া তাহাই বাহির হইয়া আসে। সৃষ্টির আদিতে প্রায় সকল পর্ব্বতই এইরূপ আগ্নেয় গিরি ছিল বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা। কালক্রমে অনেক পর্ব্বত অগ্ন্যুৎপাতের ক্ষমতা হারাইয়াছে। কিন্তু দুই চারি সহস্র বৎসর অগ্ন্যুৎপাত না হইলেই যে আগ্নেয় গিরিটি নির্ব্বাপিত হইয়াছে ইহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন না। কারণ পুনরায় যে কোন মুহূর্ত্তে নিষ্ক্রিয় গিরি সক্রিয় হইয়া বিপদ ঘটাইতে পারে।

অত্যধিক উত্তাপে ভূগর্ভস্থ বাষ্পের চাপের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অবশেষে এই চাপের পরিমাণ এতই বেশী হয় যে,

উহার ফলে গলিত পদার্থসমূহ জ্বালামুখ দিয়া সবেগে নির্গত হইতে থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের সময়ও ভূমিকম্প হইতে থাকে, কারণ অত্যধিক চাপের জন্য গলিত পদার্থ সবেগে বাহিরে আসিবার সময় পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আগ্নেয় গিরির প্রধান উদ্গীর্ণ দ্রব্য লাভা। ইহাদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়,—(১) যাহারা কেবল লাভা উদ্গীরণ করে, তাহাদিগকে **শান্ত** আগ্নেয়গিরি বলে; যেমন, হাউয়াই দ্বীপের মউনা, লোয়া, ও কিলাউয়া।

(২) আর যাহারা গ্যাস ও জলীয় বাষ্প দুরন্ত বেগে বাহির করে, তাহাদের **বিস্ফোরক** আগ্নেয় গিরি বলা হয়। যেমন, সুণ্ডা দ্বীপের ক্রাকাটোয়া আগ্নেয় গিরি।

বেশীর ভাগ আগ্নেয় গিরি এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি। তাহারা প্রথম বিস্ফোরকের মত গ্যাস ছাড়ে, যাহাতে পর্ব্বতগাত্রের শিলা চূর্ণ হইয়া শিলাধূলিতে পরিণত হইয়া বহুদূর ছড়ায়, ও পরে শান্ত আগ্নেয় গিরির মত লাভা উদ্গীরণ করে; যেমন, ভিসুভিয়স আগ্নেয় গিরি।

Questions

1. What is a fold?
2. What do you understand by a volcano?
3. What are the causes of an earthquake?

পরিভাষা

পদার্থ-বিদ্যা—Physics

অতি-বেগনি—ultra-violet
অন্তরক—insulator
অঙ্গার বিহীন লৌহ—soft iron
অপরিবাহী—non-conductor
অবলোহিত—infra-red
অভিলম্ব—normal
অভেদ্যতা—impenetrability
অস্বচ্ছ—opaque
আপতন কোণ—angle of incidence
আপতিত রশ্মি—incident ray
আপেক্ষিক গুরুত্ব—specific gravity
আলোক—light
আলোক বিচ্ছুরণ—dispersion of light
ঈথর—ether
ঈষদচ্ছ—translucent
উপচ্ছায়া—penumbra
উষ্ণতা—temperature
ঋণাত্মক—negative
ওজন—weight
কাল—period
কুপী—flask
কৈশিক নল—capillary tube
গতিশক্তি—kinetic energy
ঘননীল—indigo
ঘর্ষণ—friction
ঘর্ষ-বিদ্যুৎ—frictional electricity
চল-বিদ্যুৎ—current electricity
চাপমান যন্ত্র বা ব্যারমিটার—barometer
চাপ—pressure
চুম্বক—magnet
চুম্বক পাথর—lodestone

চুম্বকন—magnetisation
জড়তা—inertia
ডাঁটি—piston
ঢাকন—valve
তড়িৎ চুম্বক—electro-magnet
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য—wave length
তাপ—heat
থার্ম্মোমিটার—thermometer
দিগ্‌দর্শী—compass
দোলক—pendulum
দোলক পিণ্ড—bob
ধনাত্মক—positive
নারঙ্গ—orange
নিষ্ক্রিয়তা—inertia
নীল—blue
পদার্থ—matter
পরিচলন—convection
পরিপূরক—complementary
পরিবহন—conduction
পরিবাহী—conductor
পাতন বিন্দু—point of incidence
পাম্প—pump
পীত—yellow
প্রচ্ছায়া—umbra
প্রতিফলক—reflector
প্রতিফলন—reflection
প্রতিফলন কোণ—angle of reflection
প্রতিফলিত রশ্মি—reflected ray
প্রতিবিম্ব—image
প্রতিবিহিত দোলক—compensated pendulum
প্রতিসরণ—refraction
প্লবতা—buoyancy
বর্ণালী—spectrum
বিকিরণ—radiation
বিক্ষিপ্ত রশ্মি—diffused light
বিভব—potential
বিভব প্রভেদ—potential difference
বিভাজ্যতা—divisibility
বিভিন্নমুখী রশ্মি—divergent ray
বিদ্যুতাধার—electric cell
বিদ্যুৎ চুম্বক—electro-magnet
বিদ্যুৎ প্রবাহ—electric current

বিদ্যুদ্ বিশ্লেষণ—electrolysis
বিশোষন—absorption
বিস্তার—amplitude
বিস্তৃতি—extension
বেগনি—violet
মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা—mirage
মহাকর্ষ—gravitation
মেরু—pole
রশ্মি—ray
রোধ—resistance
লোহিত—red
হরিৎ—green
শক্তি—energy
সচ্ছিদ্রতা—porosity
স্ফুলিঙ্গ—spark
স্তম্ভক—cylinder
স্বচ্ছ—transparent
সংনম্যতা—compressibility
সংসক্তি—cohesion
স্থিতিস্থাপকতা—elasticity
স্থৈতিক শক্তি—potential energy

রসায়ন-বিদ্যা—Chemistry

অণু—molecule
অস্থায়ী—temporary
উপকরণ, উপাদান—ingredients
ঊর্দ্ধপাতন—sublimation
কেলাসন—crystallisation
কেলাসিত—crystalline
কৈশিক আকর্ষণ—capillary attraction
খরতা—hardness
খর জল—hard water
চুয়ান—distillation
ছাঁকন বা পরিস্রাবণ—filtration
ঢালা (কাত করিয়া)—decantation
দস্তা—zinc
দহন—combustion
দ্রবণ—solution
দ্রবণ—dissolution
দ্রাব্য—solute
দ্রাবক—solvent
দীপ—burner
পরীক্ষা নল—test tube

পরমাণু—atom
পাতন—distillation
প্রাকৃতিক জল—natural water
মিশ্রণ—mixture
মৃদু জল—soft water
মৌলিক—element
যৌগিক—compound
লবণাম্ল—hydrochloric acid
বায়বীয়—gaseous
শীতক—condenser
সংপৃক্ত দ্রবণ—saturated solution
স্থায়ী—permanent

জ্যোতির্বিদ্যা—Astronomy

অক্ষ—axis
আগ্নেয়গিরি—volcano
আলোকমণ্ডল—photosphere
উপগ্রহ—satellite
গুরুবৃত্ত—great circle
গ্রহ—planet
গ্রহণ—eclipse
গ্রহাণুপুঞ্জ—asteroids
ছটামণ্ডল—corona
দূরবীন, দূরবীক্ষণ—telescope
বর্ণমণ্ডল—chromosphere
বর্ণালীবীক্ষণ—spectroscope
বুধ—Mercury
ব্যাস—diameter
বৃহস্পতি—Jupiter
মঙ্গল—Mars
শঙ্কু—cone
শনি—Saturn
শুক্র—Venus
সৌর কলঙ্ক—sun-spot

ভূতত্ত্ব—Geology

অভ্র—mica
আগ্নেয়—igneous
আন্দোলন—movement
কাত—tilted
কোয়ারট্‌জ্—quartz
খাড়া—vertical

জৈব—organically derived
জ্বালামুখ—crater
পরিবর্ত্তিত—metamorphic
পালল—sedimentary
প্রকম্পন কটিবন্ধ—seismic belt
ফেলস্পার—felspar
ব-দ্বীপ—delta
বেলে পাথর—sandstone
ভাঁজ—folds
ভূকম্পন-লেখক যন্ত্র—seismograph
শিলা—rock
সমান্তরাল—horizontal
স্তরচ্যুতি—fault
হিমসরিৎ—glacier

Syllabus in Elementary Science
for Classes VII and VIII

(*a*) The three states of matter. Physical properties of air and water. Buoyancy and Archimedes' principle. Pressure of atmosphere. Effect of heat on air. Ventilation. Effect of heat on solid bodies. Pendulum Clock and Thermometer. Transference of heat. Simple ideas regarding energy and its transformations with examples. Rectilineal propagation of light. Phenomena of reflection and refraction of light ; colour and rainbow. Lodestone, magnetisation, terrestrial magnetism and compass. Simple Electric Cell. Conductors and insulators. Effects of current: (*i*) heating and lighting, (*ii*) chemical, (*iii*) magnetic. Electro-magnet and Electric Bell. Telegraphy.

(*b*) Separation of Mixtures—solution, filtration, crystallisation, distillation, sublimation. Rusting of iron and burning of candle, magnesium and sulphur in a closed volume of air over water. Air, its composition. Properties of Oxygen, Nitrogen and Carbon dioxide. Water, its composition. Properties of Hydrogen. Natural and aerated waters. Properties of hard and soft water. Characteristics of chemical compounds.

(*c*) The Sun—its dimension and distance from the Earth. Planetary system—relative positions. Eclipses of Sun and Moon.

(*d*) The Earth—condensation from a hot gaseous state—its crust—igneous and sedimentary rocks. Earth movement (earthquake)—volcano.